৮ অগস্ট ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

■ বেসিকের দ্বিতীয় ধাপ
■ এসেলওয়ার্ল্ডই কি ভারতের প্রথম ডিজনিল্যান্ড
■ সমরজিৎ করের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস : ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা

■ স্কিলাচির রঙিন পোস্টার
■ এশিয়াড এসে গেল
■ টেনিসে ভারতের আশা লিয়ান্ডার পেজ

রোমাঞ্চকর
বিমান-যুদ্ধ

শান্তির পৃথিবীতে জঙ্গি বিমানের কেন এই কালো ছায়া ? কোন বিমান বেশি শক্তিশালী ? এফ-সিক্সটিন, না মিরাজ ? কোন দেশে আছে কী কী জঙ্গি বিমান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

কুঁচবরন কন্যা, মেঘবরন চুল,
টাটাস্ গ্রীন হেয়ার অয়েল
আমার মাখতে হয়না ভুল
তাইতো আমার দোলদোলানো
রেশমী ঘন, লম্বা চুল

টাটার
তৈরি

টাটাস্ গ্রীন,
মেরা হেয়ার অয়েল জেনে নিন
এর আমলার গুণ পুষ্টি জোগায়
চুল সুস্থ রাখে, স্টাইলে সাজায়
টিকন কিন্তু চটচটে নয়
এতসব গুণ কোন তেলে রয়!

টাটাস্ গ্রীন হেয়ার অয়েল
আমলার গুণ ভরা তেল

চুলের যত্নের রূপ ফোটে
তেলালো নয় মোটে

CHAITRA-B TM 280 BEN

সূচীপত্র

২২ শ্রাবণ ১৩৯৭ □ ৮ অগস্ট ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ৯ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশে) ■
ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সমরজিৎ কর ৫৪
■ গল্প ■
ম্যাজিক দূরবিন অমর মিত্র ২২
ভুতুড়ে গাড়ির যাত্রী কণা বসু মিশ্র ৩৪
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
রোমাঞ্চকর বিমান-যুদ্ধ গৌতম চক্রবর্তী ১২
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
■ কমিক্‌স ■
টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
■ কবিতা ■
আচমকা ঘুম ভেঙে সুনীল বসু ২৬
■ টাকাকড়ি ■
প্রাক মৌর্য ও মৌর্যযুগের ··· ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৮
■ এই দেশ এই বিশ্ব ■
এসেলওয়ার্ল্ড কি ভারতের··· বিকাশ চক্রবর্তী ৩২
■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■
বেসিকের দ্বিতীয় ধাপ অসীমরতন ঘোষ ৬৩
■ কেরিয়ার গাইড ■
হোটেল ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রি কোর্স অমর দাশ ২৮
■ খেলাধুলো ■
দাবাড়ু আনন্দের কোচ ও প্রেরণা···সব্যসাচী সরকার ৩৯
রঙিন পোস্টার : সালভাদোর স্কিলাচি ৪১
টেনিসে লিয়ান্ডারই ভারতের আশা অমিতাভ ঘোষ ৪৪
বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা···দীপক মজুমদার ৪৬
বিশ্বের সেরা সুইপার ব্যাক বারেসি অয়ন রায় ৪৭
এশিয়াড এসে গেল কৃশানু ভট্টাচার্য ৪৮
■ নিয়মিত বিভাগ ■
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, ক্যাম্পাস ৩০, আঁকিবুকি ৩৮, হাসিখুশি ৩৮, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, শব্দসন্ধান ৫৮, আকাশে ওড়ার কথা ৬২, কুইজ ৬৮, বাইরের জানালা ৮০, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২
■ প্রচ্ছদ ■
ধ্যানসিং থাপা

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১২ পৃথিবীর মানুষ শান্তি চায়। চায় সুখ ও সমৃদ্ধি। তবু প্রতিরক্ষার নামে চলে মারাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। কোনও দেশই ঝুঁকি নিতে চায় না। অত্যাধুনিক সমরসম্ভার সংগ্রহ করে এক-একটি দেশ চায় অন্যদের টেক্কা দিতে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে নানা গবেষণা। প্রতিরক্ষার একটা বড় অংশই আবার আকাশকেন্দ্রিক। আকাশপথে জঙ্গি বিমানে শত্রুদের ওপর হানা দেওয়া সহজ। তাই এখন এফ সিক্সটিন, মিগ, মিরাজ নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে কোন বিমান বেশি শক্তিশালী ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী ধরনের বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল ? ভারতের বিমানবহরে কী কী বিমান আছে ? আছে কী ধরনের হেলিকপ্টার ? এ-ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে।

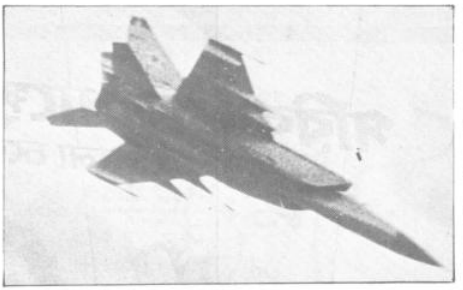

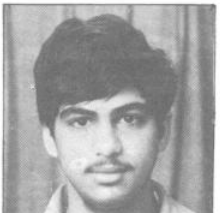

৩৯ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপে এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বিশ্বনাথন আনন্দ। খেলাধুলোয় কোনও ভারতীয়ের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হিসেবে এটাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এই মুহূর্তে ভারতের কনিষ্ঠতম 'অর্জুন' বিশ্বনাথনের মধ্যে ভারত এক সম্ভাব্য বিশ্বজয়ীকে দেখতে পাচ্ছে। এই অসাধারণ প্রতিভাবান দাবাড়ুকে নিয়ে প্রকাশিত হল একটি নিবন্ধ।

৫৪ কুমেরু মহাদেশের হিমশীতল ভিক্টোরিয়া ল্যান্ডে অদ্ভুত এক শৈবাল আবিষ্কার করেছেন ডক্টর বাসু ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। তুষারঝড়ের প্রবাহেও এই শৈবালের কোষগুলি বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কী আছে ওই শৈবালের মধ্যে ? এই রহস্যের উদ্ঘাটন হতে না হতেই আর-এক বিস্ময়। এক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী।

■ আগামী সংখ্যায় ■

অদ্রীশ বিশ্বাস ও দীপক রায়ের প্রচ্ছদকাহিনী
ম্যাজিক ! ম্যাজিক !!

পি সি সরকার (জুনিয়ার)-এর সাক্ষাৎকার

অজিতকৃষ্ণ বসুর
একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

সমরেশ মজুমদারের ধারাবাহিক উপন্যাস
কালাপাহাড়

পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্যে বরদান

১ কিলো চকোলেট কমপ্লান

Complan®
COMPLETE PLANNED FOOD
CHOCOLATE FLAVOUR

FREE!
Collect a ceramic mug with this pack.

No need to add milk

বিনামূল্যে!

৫০০ গ্রামের দুটিন চকোলেট কমপ্লান কেনার বদলে, ১ কিলোর একটিন কিনুন আর ৪/- টাকা বাঁচান, সঙ্গে লাভ করুন বিনামূল্যে একটি সেরামিকের মগ্!
কমপ্লান-এ আছে আপনার পরিবারের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

আজই কিনুন!

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

কমপ্লান®

GX/58/244 BEN

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসি রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বেশ কয়েকবার করাঘাত করার পরেও দরজা খুলল না, ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। শিল্পী জয়পাল পুরোহিত ছত্তীর নাম ধরে ডাকলেন কয়েকবার, তবু উত্তর দিল না কেউ।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ একবার পেছন ফিরে তাকাল। শুম্ভ আর নিশুম্ভ আহত ও পরাজিত হওয়ায় আর কোনও সৈন্য এদিকে ধেয়ে আসছে না।

বাহুক বলল, "ভেতরে কেউ নেই নাকি? তবে দরজা বন্ধ কেন?"

শিল্পী জয়পাল বললেন, "দ্বার ভেঙে দেখতে হবে!"

ওরা তিনজনেই পিছিয়ে গেল কিছুটা। তারপর একসঙ্গে ছুটে এসে লাথি মারল। বিশাল দরজা তাতে সামান্য কেঁপে উঠল মাত্র।

আবার ওরা পিছিয়ে গেল।

এইভাবে দশবারের চেষ্টায় মড়মড় শব্দ করে উঠল একটা পাল্লা। শিল্পী মল্লপাল এবার কাঁধ দিয়ে একটা চাড় দিতেই দরজা ভেঙে পড়ল।

অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনজনে লাফিয়ে চলে এল ঘরের মধ্যে।

সেখানে কেউ নেই। শয্যা শূন্য। অন্য কোনওদিক দিয়ে পালাবার পথ নেই, অথচ ঘরের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

বাহুক মস্তবড় পালঙ্কটি টেনে সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল সেখানে রয়েছে একটি সুড়ঙ্গের মুখ।

শিল্পী জয়পাল হতাশ ভাবে বললেন, "যাঃ! পুরোহিত ছত্তী আগে থেকেই পালাবার পথ তৈরি করে রেখেছিল। এখান দিয়ে নিশ্চয়ই সে রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে গেছে এতক্ষণে।"

বাহুক বলল, "পালালেও কতদূরেই বা সে যাবে! চলুন, এই সুড়ঙ্গ পথ কোনদিকে গেছে, দেখা যাক।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "দাঁড়ান, আমি আগে যাব। এই পথে যদি কোনও প্রহরী লুকিয়ে থাকে, তবে প্রথমে আমি তার মুখোমুখি হতে চাই।"

তলোয়ার উদ্যত করে রাজকুমার তীক্ষ্ণ নামতে লাগল সেই সুড়ঙ্গের সিঁড়ি দিয়ে। বেশিদূর যেতে হল না। একটু পরেই দেখা গেল একটা লম্বামতন ঘর। সম্পূর্ণ অন্ধকার, শুধু মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার একপাশে বসে আছেন পুরোহিত ছত্তী। লাল রঙের কাপড় পরা, একমনে তিনি ঘি ঢেলে দিচ্ছেন সেই যজ্ঞের আগুনে।

রাজকুমার তীক্ষ্ণনর দু'পাশে শিল্পী জয়পাল এবং বাহুক থমকে গেল।

শিল্পী জয়পাল বললেন,"পুরোহিত ছত্তী। তোমার খেলা এবার শেষ। আমরা এসে পড়েছি!"

মুখ তুলে ছত্তী গম্ভীর ভাবে বললেন, "কী চাও!"

বাহুক বলল, "তোমার ছিন্ন মুণ্ড!"

তাকে অগ্রাহ্য করে ছত্তী রাজকুমার তীক্ষ্ণর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসেছ, কুমার! এসো। তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছ। জেনে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রাজ্য তোমার! এতকাল আমি তোমার রাজ্য রক্ষা করেছি। এবার তুমি নাও!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "এটা আমার পিতার রাজ্য। আপনার হাত থেকে নিতে যাব কেন?"

ছত্তী বললেন, "এবার আমি বনবাসে যাব। সংসার আর আমার ভাল লাগছে না। তোমার দায়িত্ব বুঝে নাও, কুমার। আমি তো নিজের জন্য এই রাজ্য কখনও চাইনি!"

বাহুক বলল, "তোমাকে কোথাও যেতে দেব না, শয়তান!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ এক পা এগিয়ে বলল, "আপনি আমার পিতাকে হত্যা করেছেন, আমার মাকে বন্দিনী করে রেখেছেন কারাগারে। আমি সব জেনেছি। আমি আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছি!"

ছত্তী বললেন, "সাবধান! আর এগিও না! আমি এই যজ্ঞে হবি দিয়েছি। এই আগুনের এক হাতের মধ্যে এলে আমার অভিশাপে ভস্ম হয়ে যাবে!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ আবার এগোতে যেতেই শিল্পী জয়পাল তার হাত চেপে ধরে বললেন, "এগোবেন না, রাজকুমার। আমাদের অন্য পন্থা ভাবতে হবে। এইসব ব্রাহ্মণের দৈবশক্তি থাকে। আপনাকে ভস্ম করে দিতে পারে।"

শিল্পী জয়পালের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "এই ব্রাহ্মণ পাপী। এই ব্রাহ্মণ খুনি। এঁরও যদি দৈবশক্তি থাকে, তবে সেই দৈবশক্তিকে ধিক! আমি গ্রাহ্য করি না।"

তারপর এক লাফে অগ্নিকুণ্ড পার হয়ে এসেসে ছত্তীর চুলের মুঠি চেপে ধরল এক হাতে। অন্য হাতে উঁচিয়ে ধরল তলোয়ার।

কিন্তু এক কোপে সে ছত্তীর মুণ্ডু কাটতে পারল না। তার হাত কাঁপছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, এই পুরোহিত ছত্তীর সঙ্গে সে বছরের পর বছর কাটিয়েছে। কখনও ছত্তী তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি, বরং স্নেহ করেছেন খুব। বিচিত্র মানুষ এই ছত্তী! তীক্ষ্ণর বাবাকে মেরেছেন, মাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন, তবু তীক্ষ্ণকে তিনি পরম যত্নে রেখেছেন।

বাহুক চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "দেরি করছেন কেন, কুমার? শত্রুর শেষ রাখবেন না!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ কোনও উত্তর দিল না।

তখন বাহুকও আগুনের বেড়া পার হয়ে এসে বলল, "আপনি না পারেন, আমাকে ছেড়ে দিন। এই পাপী আমার বাবার মুণ্ডু কেটে ফেলেছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আজ এর ছিন্ন মুণ্ডু দেখে আমার হৃদয় জুড়োবে।"

বাহুক ছত্তীকে মারবার জন্য অস্ত্র তুলল।

সেই মুহূর্তে শিল্পী জয়পাল হেঁকে বললেন, "দাঁড়াও, বাহুক, দাঁড়াও! এখনই ওই পাপীকে মেরো না। ওকে বন্দী করে নিয়ে চলো। মহারানি তলতাদেবী কারাগারে কী অবস্থায় আছেন আমরা জানি না। চলো, আগে তাঁর খোঁজ করি। মহারানিই ওকে শাস্তি দেবেন।"

লোহার শিকল দিয়ে ছত্তীর হাত-পা বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে আসা হল রাজপথ দিয়ে। প্রজারা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারা যেন ধরেই নিয়েছিল, ছত্তীর অশুভ শাসন থেকে তারা আর কোনওদিন মুক্তি পাবে না। ছত্তীকে কেউ পছন্দ করত না। কিন্তু তাঁর কোনও কথাতেও প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না কেউ!

কালাঘর দুর্গের দ্বার খোলা। সমস্ত প্রহরী সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "জয়, রাজকুমার তীক্ষ্ণর জয়!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ সেদিকে একেবারেই মনোযোগ দিল না। শিল্পী জয়পালকে অনুসরণ করে সে লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

একটার পর একটা দ্বার খুলতে-খুলতে ওরা এসে পৌঁছল একেবারে কোণের সেই ঘরে। অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালের পাশে বসে আছেন তলতাদেবী।

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় ডেকে উঠল, "মা!"

তলতাদেবী অমনই মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কে?"

তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এলেন। তাঁর মাথার অনেক চুল সাদা হয়ে গেছে, তবু আগেকার সেই তেজস্বিনী রূপ নষ্ট হয়নি। এতকাল অন্ধকারে থেকেও তাঁর চোখের জ্যোতি

তীক্ষ্ণ।

কাছে এসে বললেন, "কে আমাকে মা বলে ডাকল ? কতকাল ওই ডাক শুনিনি !"

শিল্পী জয়পাল আবেগের সঙ্গে বলল, "মহারানি ! মহারানি ! আপনার পুত্র তীক্ষ্ণ এসেছে !"

তলতাদেবী অমনি তীক্ষ্ণকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তীক্ষ্ণ ? আমার সেই তীক্ষ্ণ ? এতকাল তুই কোথায় ছিলি ? আর একবার ডাক। আর একবার মা বল !"

তীক্ষ্ণ এবার একটু লজ্জা পেয়ে গেল। সেও তো বহু বছর মা শব্দটা উচ্চারণ করেনি। সেই বাচ্চা বয়েসের পর মাকে সে আর দেখেনি। শুধু স্বপ্নে মাঝে-মাঝে একটা মুখ ভেসে উঠত !

সে খুব আস্তে বলল, "মা ! আমি এসেছি ! আর তোমার কোনও দুঃখ থাকবে না।"

এই সময় বাহুক পুরোহিত ছত্তীকে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল মহারানি তলতাদেবীর পায়ের কাছে !

তলতাদেবী চমকে একটুখানি সরে গেলেন।

পুরোহিত ছত্তী কাতরভাবে বললেন, "মহারানি ! আমি আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছি না। শুধু একটা দয়া ভিক্ষা করছি। আমাকে যা শাস্তি দেওয়ার আপনিই দিন। এই লোকগুলোকে ছুঁতে দেবেন না আমার শরীর। আমার মৃতদেহও যেন এরা না ছোঁয় !"

তলতাদেবী বললেন, "রাজপুরোহিত ! একদিন আপনি সগর্বে বলে গিয়েছিলেন, এ-রাজ্যে আর কোনও মহারানি নেই ! আজ আপনি আবার নিজের মুখেই আমাকে মহারানি বলে ডাকলেন !"

বাহুক বলল, "এবার একে শেষ করে দিই ?"

তলতাদেবী ছত্তীর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "মনে আছে, সেদিনের কথা ? আমাকে এই কারাগারে বন্দী করে বলেছিলেন, আর কোনওদিন আমি দিনের আলো দেখতে পাব না ? আমি বলেছিলাম, যদি বেঁচে থাকি, তবে একদিন ঠিকই দেখব, কেউ আপনাকে পদাঘাতে সিংহাসন থেকে ফেলে দেবে ! সেই দিনটা দেখার জন্য আমি এতদিন বেঁচে ছিলাম। আপনার পদাঘাতটা পাওনা আছে।"

তিনি তাঁর বাঁ পা দিয়ে ছত্তীর মুখে একবার আঘাত করলেন।

তারপর বাহুককে আদেশ দিলেন, "ওঁর শিকল খুলে দাও ! কেউ ওঁর গায়ে আর হাত দেবে না। ওঁকে মারবে না। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখো। যে কারাগারে আমি ছিলাম, সেইখানে এখন থেকে ছত্তী থাকবেন। এই অন্ধকারে। নির্মম নিঃসঙ্গতায় ! মাঝে-মাঝে আমি এসে ওঁকে দেখে যাব। এই হবে ওঁর শাস্তি। এই হবে আমার প্রতিশোধ !"

এর পর সারা রাজ্যে আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল বটে, তবু সব সমস্যা মিটল না।

তিনদিন ধরে বিরাট উৎসব হল, প্রজারা জয়ধ্বনি দিতে লাগল মহারানি আর রাজকুমারের নামে, কিন্তু এ দু'জনকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। রাজপ্রাসাদে সব দাসদাসীরা ফিরে এসেছে, অথচ তাদের আদেশ দেওয়ার কেউ নেই, মাতা আর পুত্র একটি কক্ষে বসে থাকে প্রহরের পর প্রহর। আড়াল থেকে কোনও-কোনও দাসদাসী মহারানিকে কাঁদতে দেখেছে।

মহারানি তলতাদেবী চেয়েছিলেন, ছত্তীকে বন্দী করার পরের দিনই রাজকুমার তীক্ষ্ণর অভিষেকের কথা ঘোষণা করে দেবেন। রাজা হয়ে তীক্ষ্ণ বসবে সিংহাসনে। এ-রাজ্যের সিংহাসনের সে-ই তো উত্তরাধিকারী। তার অভিষেকের উৎসবে আমন্ত্রণ করা হবে প্রতিবেশী সব রাজ্যের রাজাদের।

কিন্তু রাজকুমার তীক্ষ্ণ কিছুতেই রাজা হতে রাজি নয় !

সে বারবার বলছে, "মা, তুমি সিংহাসনে বসো ! এই সিংহাসন তোমারই জন্য এতকাল খালি পড়ে ছিল !"

মহারানি তলতাদেবী সে-কথা শুনেই প্রবলভাবে মাথা নাড়েন। তিনি তাঁর স্বামীর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কোনওদিন তিনি সিংহাসনে বসবেন না।

মা আর ছেলের এই নিয়ে তর্ক চলছে অনবরত।

তীক্ষ্ণ বলছে, "সে ফিরে এসেছে মাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে আর পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে। সিংহাসনের কথা সে একবারও ভাবেনি !"

মহারানি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কেন সিংহাসনে বসবি না, তীক্ষ্ণ ! বল, বল, বল !"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ উত্তর দিল, "মা, আমি আর-এক রাজকুমারকে দেখেছি। তিনিও সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে, নিজের রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছেন। কী অপূর্ব সুন্দর হাসি তাঁর মুখে। কোনও রাজা ওরকম হাসতে পারে না।"

"তিনি কোন রাজ্যের রাজকুমার ?"

"কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র তিনি। সবাই তাঁকে এখন গৌতম বুদ্ধ বলে জানে।"

"কেন সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে এলেন তিনি ?"

"সবাই বলে, তিনি নিজের রাজ্য ছেড়ে এসেছেন বটে, কিন্তু বহু মানুষের হৃদয়ের রাজা হয়েছেন। তিনি কিছুই চান না, তবু সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে যেতে চায়। আমিও তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে চাই !"

"তবে চল কুমার, আমিও তোর সঙ্গে যাই ! তোকে ছেড়ে আমি কী করে থাকব ?"

এই রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাপতি ও পাত্রমিত্ররা এই কথা শুনে হাহাকার করে ওঠে। মহারানি যদি চলে যান, রাজকুমার তীক্ষ্ণও যদি চলে যায়, তা হলে কি সিংহাসন শূন্য পড়ে থাকবে ? রাজ্য চালাবে কে ?

মহারানি তলতাদেবী বাহুক আর শিল্পী জয়পালকে ধরলেন রাজকুমার তীক্ষ্ণকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করবার জন্য। কিন্তু রাজকুমার কারও কথা শুনতে রাজি নয় !

এইরকম অনিশ্চয় অবস্থার মধ্যে কাটতে লাগল দিনের পর দিন।

তারপর হঠাৎ বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা !

অহিছত্রপুরের সিংহাসন শূন্য, রাজ্য শাসন করার দিকে কারও মন নেই। এই সংবাদ রটে গেছে চতুর্দিকে। সেই সুযোগ নিয়ে এক বিদেশী রাজা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ করেছে।

আবার সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। যে-কোনও উপায়ে অহিচ্ছত্রপুর রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেবে কে ? আর কে, অবশ্যই রাজকুমার তীক্ষ্ণ ! মহাবীর এই রাজকুমার, তার নাম শুনলেই শত্রুরা কাঁপবে !

কিন্তু রাজকুমার তীক্ষ্ণ তাতেও রাজি নয়। সে আর যুদ্ধ করতে চায় না। যুদ্ধ মানেই তো নরহত্যা। সে আর কিছুতেই রক্তদর্শন করবে না ঠিক করেছে।

মহারানি তলতাদেবী এবার কেঁদে পড়লেন। নিজেও আর কোনওদিন অস্ত্র ধরবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তা হলে কী হবে ? তিনি কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "আমার এতবড় বীর পুত্র থাকতেও এই রাজ্য পরাধীন হবে ? তা হলে আমি আত্মঘাতিনী হব। পরাধীন দেশে আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না।"

শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে অস্ত্র হাতে নিতেই হল রাজকুমার তীক্ষ্ণকে।

প্রজারা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল, সৈন্যরাও দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠল।

সাদা ঘোড়ায় চড়ে সকলের আগে-আগে চলল রাজকুমার তীক্ষ্ণ। তার দু'পাশে বাহুক আর শিল্পী জয়পাল। এক সময় বাহুক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এ কী, কুমার, আপনার চোখে জল কেন ?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ ধরা গলায় বলল, "আমার ভাল লাগছে না, আমার ভাল লাগছে না ! মানুষ কেন মানুষকে মারবে ? এক রাজা কেন অন্য রাজ্য দখল করার লোভ করবে ? যুদ্ধ ছাড়া কি মানুষ সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে না ?"

শিল্পী জয়পাল বললেন, "কুমার, আপনি ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধ অতি নিন্দনীয়। কিন্তু সবাই যে তা বোঝে না ! শত্রু আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করতেই হয়। না হলে পরাধীন হয়ে থাকতে হয়। পরাধীন জাতির মেরুদণ্ড নষ্ট হয়ে যায়। পরাধীনতা নরকবাসের তুল্য। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেই হয়।"

অশ্রু মুছে, অস্ত্র তুলে, চোয়াল কঠিন করে রাজকুমার তীক্ষ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়ল রণে।

তাঁর শৌর্যের সামনে বিপক্ষের যোদ্ধারা কেউ দাঁড়াতেই পারল না। সকলে ভয়ে পালাতে লাগল। অন্যদিকের সৈন্যবাহিনী ভেদ করে এগোতে লাগল রাজকুমার তীক্ষ্ণ !

হঠাৎ বাহুক দারুণ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রাজকুমার দেখুন ! দেখুন !"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ অশ্বের রাশ টেনে বলল, "কী হয়েছে ?"

বাহুক বলল, "সামনে তাকিয়ে দেখুন।"

একটু দূরেই একটি কালো ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন শত্রুপক্ষের রাজা। তিনি যেন যুদ্ধ ভুলে প্রচণ্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন রাজকুমারের দিকে।

রাজকুমার বলল, "মাথায় মুকুট, ইনিই তা হলে রাজা ? এঁকে জয় করতে পারলেই যুদ্ধ থেমে যাবে ?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ আবার আক্রমণে উদ্যত হতেই বাহুক তার হাত ধরে টেনে বলল, "কুমার, ভাল করে দেখুন। কিছু বুঝতে পারছেন না ?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ সামনে তাকিয়ে বলল, "শত্রুপক্ষের রাজাকে চেনা-চেনা লাগছে যেন ?"

বাহুক বলল, "ওঁকে অবিকল আপনার মতন দেখতে !"

এই সময় শিল্পী জয়পাল সেখানে পৌঁছে চিৎকার করে বললেন,

"ইনি তো আপনার বড় ভাই ! রাজকুমার দৃঢ় !"

তারপর তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে বললেন, "বড় রাজকুমার, বড় রাজকুমার, আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি জয়পাল !"

বিরুদ্ধপক্ষের রাজা ভুরু কুঁচকে বললেন, "না, চিনতে পারছি না। কে জয়পাল ?"

শিল্পী জয়পাল বললেন, "কালাঘর দুর্গে আমি রক্ষী ছিলাম। আমরা একসঙ্গে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম, মনে নেই ? শেষকালে কোনও উপায় না দেখে আমরা দু'জনেই উঁচু গম্বুজ থেকে ঝাঁপ দিলাম নদীতে।"

রাজা অস্ফুটভাবে বললেন, "কালাঘর দুর্গ ? আমি সেখানে বন্দী ছিলাম ? একটা অন্ধকার ঘরে ?"

শিল্পী জয়পাল বললেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ ! আপনি তো এই রাজ্যেরই রাজকুমার ! আপনি বড় রাজকুমার দৃঢ়। আপনি আপনার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন।"

রাজা আবার বললেন, "আমার ছোট ভাই ?"

তারপর তিনি হাত তুলে বললেন, "যুদ্ধ বন্ধ করো ! যুদ্ধ বন্ধ করো ? সব মনে পড়েছে ! এতকাল আমি অন্ধকারে ছিলাম ! এ তো আমার পিতার রাজ্য ! আমার মা কোথায় ?"

ঘোড়া থেকে নেমে তিনি দৌড়ে এলেন। রাজকুমার তীক্ষ্ণও নেমে দাঁড়াল। তারপর দুই ভাই আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

অস্ত্র নামিয়ে অন্য সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "দাদা, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। এ-রাজ্যের সিংহাসন তোমার জন্য শূন্য পড়ে আছে !"

রাজা দৃঢ় বললেন, "না, না, আমার অন্য রাজ্য আছে। আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাব। এই রাজ্য তোর থাকবে !"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ তার তলোয়ারটা বড় ভাইয়ের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে বলল, "আমি কোনওদিন রাজা হব না। আমি আর কোনওদিন অস্ত্র ধরব না। এই আমার শেষ শপথ !"

এর পর দুই ভাই চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

বাহুক রাজকুমার তীক্ষ্ণকে বলল, "কুমার, এবার তো সব কিছুই আনন্দময় হয়ে গেল। আপনি নিজের বড় ভাইকে ফিরে পেলেন। এখন এই সিংহাসনে আপনি না বসলেও আপনার মা দুঃখ পাবেন না। তিনি তাঁর বড় ছেলেকে রাজত্ব দেবেন। সবই ঠিক হয়ে গেল। তবু আপনার মুখখানা বিষণ্ণ কেন ?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "বাহুক, আমি এই রাজ্য ছেড়ে আজই করুণাময় বুদ্ধের কাছে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জেগেছে, তিনি কি আমাকে গ্রহণ করবেন ? তিনি আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না তো ?"

বাহুক বলল, "কেন, আপনার মনে এই সন্দেহ জাগছে কেন ?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "আমি এত রক্ত মেখেছি হাতে। এত লড়াই করেছি। এর জন্য তিনি আমাকে ঘৃণা করবেন না ?"

বাহুক বলল, "তিনি তো কোনও মানুষকেই ঘৃণা করেন না। আপনি বুঝি অঙ্গুলিমালকে দেখেননি ? অঙ্গুলিমালের পূর্বকথা জানেন না ? অঙ্গুলিমাল ছিল আগে এক দস্যু। কত মানুষ মেরেছে। পরম করুণাময় বুদ্ধ তার জীবনেও পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। সে এখন ভক্ত।"

শিল্পী জয়পাল বললেন, "কুমার, আপনি যখন বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি কী জানিয়েছিলেন মনে নেই ? তিনি বলেছিলেন, এখনও সময় হয়নি। তিনি কাউকেই ফিরিয়ে দেন না। তবে, আপনার সময় হয়েছে কি না তা ওখানে গিয়ে আপনাকে দেখতে হবে। হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে !"

সেদিন রাজবাড়ির উৎসবে অংশ নিলেন কুমার তীক্ষ্ণ। রাজা দৃঢ়কে অহিছত্রপুরেরও রাজা বলে ঘোষণা করা হল।

তারপর রাজকুমার তীক্ষ্ণ বিদায় চাইলেন মায়ের কাছে।

এই সন্তানটিকে যে আর কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না, তা বুঝতে পেরেছেন তলতাদেবী। সিংহাসনের প্রতি এর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। এতবড় বীর হয়েও সে চিরকালের মতন অস্ত্র ত্যাগ করেছে। তাই আর বাধা দিলেন না রাজমাতা তলতাদেবী। চোখের জল গোপন করে তিনি তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন।

বাহুক আর শিল্পী জয়পালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তীক্ষ্ণ। ওদের দু'জনকেই সে জানিয়ে দিল, আর আমাকে রাজকুমার বলে ডাকবেন না। এখন থেকে আমি শুধু তীক্ষ্ণ।

এখন ওদের সঙ্গে ঘোড়াও নেই। চলেছে পায়ে হেঁটে। সারাদিন পথ হাঁটে, রাত্রে কোনও গাছতলায় ঘুমোয়। তবু পথ চলায় ওদের ক্লান্তি নেই।

প্রায় দশদিন পরে ওরা এসে পৌঁছল বৈশালীতে। কিন্তু সেখানে এসে ওরা নিরাশ হল খুব। বুদ্ধ সেখানে নেই। তিনি সদা ভ্রাম্যমাণ। সদলবলে অন্য কোথাও চলে গেছেন।

স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে ওরা এবার গেল শ্রাবস্তীতে। সেখানেও বুদ্ধকে ধরা গেল না। এবার শোনা গেল, তিনি গেছেন কাশীর কাছে সারনাথ গ্রাম। সেখানে পৌঁছে বহু মানুষের সমাগম দেখে ওরা নিশ্চিন্ত হল।

বুদ্ধদেব এক-একদিন সন্ধেবেলা কোনও গাছতলায় বসে ভক্তদের উপদেশ দেন ও অনেকরকম গল্প বলেন। আবার মাঝে-মাঝে দু-তিনদিন তিনি দেখা করেন না কারও সঙ্গে। ধ্যানে মগ্ন থাকেন কিংবা একা-একা ভ্রমণ করেন বনের মধ্যে।

সারনাথে এসে ওরা শুনল, "গত দু'দিন ধরে বুদ্ধদেব কাউকে দর্শন দিচ্ছেন না।"

তীক্ষ্ণ ধৈর্য ধরতে পারছে না। এত যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে যে, তার নিজের শরীরটা অপবিত্র মনে হচ্ছে। শতবার স্নান করলেও যেন সেই রক্তের দাগ মোছা যাবে না। কিন্তু করুণাময় বুদ্ধ একবার ছুঁয়ে দিলেই সে পবিত্র হয়ে যাবে।

সারনাথ গ্রামে পৌঁছবার পরের দিন তীক্ষ্ণ একা-একা ঘুরতে-ঘুরতে লোকালয় ছাড়িয়ে চলে গেল অরণ্যে। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে সবে বর্ষা শুরু হয়েছে। বৃষ্টির জলে ধোয়া গাছপালাগুলি থেকে ঘুচে গেছে মলিনতা। কয়েকটি ময়ূর খেলা করছে একটা জলাশয়ের ধারে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ দেখতে পেল এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে। দেখা মাত্র চিনতে পারল সে। এর মধ্যে আর একটু যেন শীর্ণ হয়েছেন তিনি। কিন্তু চক্ষু দুটি শান্তিময়।

তিনি আপনমনে ভ্রমণ করছেন। এক সময় তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন তীক্ষ্ণকে। তিনি সামান্য হাসলেন।

সহসা কোনও কথা বলতে পারল না তীক্ষ্ণ। সে এগোতেও

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে

সমরেশ মজুমদারের

নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

কালাপাহাড়

পারল না, তার পা যেন ভূমিতে আটকে গেছে। সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।

বুদ্ধও তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

বেশ কিছু মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর তীক্ষ্ণ কোনওরকমে আস্তে-আস্তে বলল, "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি !"

বুদ্ধও ধীরস্বরে বললেন, "ধম্মং সরণং গচ্ছামি !"

তীক্ষ্ণ আবার বলল, "সঙ্ঘম সরণম গচ্ছামি।"

এবার বুদ্ধও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন, "সঙ্ঘম সরণং গচ্ছামি !"

তীক্ষ্ণর সারা শরীরে যেন একটা আনন্দের স্রোত খেলে গেল। সে বলল, "আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ? আমার নাম তীক্ষ্ণ !"

বুদ্ধ বললেন, "আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি তীক্ষ্ণ নও, এখন থেকে তুমি উদাত্ত। তোমার নতুন জন্ম হয়েছে, এই জন্মের নাম উদাত্ত !"

কাছে এসে তিনি তাকে ছুঁয়ে দিতেই তার চক্ষু দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। আগে যে তীক্ষ্ণ ছিল, এখন সে উদাত্ত। তার চোখে যে অশ্রু, তা শুধু আনন্দের। এমন আনন্দের স্বাদ সে আগে কখনও পায়নি ! (সমাপ্ত)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

জীবন বাঁচাতে বিষধর সাপ

অসম্ভব মনে হলেও কথাটা সত্যি। বিশেষ করে কেউ যদি হার্টের রুগি হন, আর তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে থাকে তা হলে মালয়েশিয়ার বিষাক্ত গেছো বোড়া তাঁর জীবন বাঁচাতে পারে।
ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস হেল্‌থ সায়েন্স সেন্টারের ডেভিড ডি শেরম্যান লক্ষ করেছেন যে, মালয়েশিয়ান পিট ভাইপারের কামড়ে যারা মারা যায় তাদের বেশিরভাগই মারা যায় অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে, বিষক্রিয়ায় নয়। গবেষণা করে দেখা গেছে, পিট ভাইপারের বিষে এমন একটি এনজাইম রয়েছে, যা রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। স্ট্রোকে আক্রান্ত হৃদরোগীদের চিকিৎসার জন্য গবেষকরা এই এনজাইমটিকেই কাজে লাগানোর কথা ভাবছেন।
প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং তাঁদের মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হয়। এঁদের শতকরা ৮৫ ভাগের স্ট্রোকের কারণ জমাট-বাঁধা রক্ত। এই রক্তকে তরল করার কোনও চিকিৎসা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। শেরম্যানের মতে, এই রুগিদের নিরাময় করতে হলে স্ট্রোক হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এনজাইম নিষিক্ত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। তবে এই কাজটি করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। যদি ওষুধের মাত্রা বেশি হয়ে যায় তা হলে নিঃসন্দেহে রুগি মারা পড়বে—যেমনটি মারা যায় পিট ভাইপারের ছোবলে।
পরীক্ষামূলকভাবে যে-ওষুধ তৈরি হয়েছে রুগি-পিছু তার দাম ২০০ ডলার। প্রতি সপ্তাহে ৪০০ পিট ভাইপারের বিষ সংগ্রহ করে এই ওষুধ তৈরির কাজ চলছে। 'আর্ভিন' নামে এই ওষুধ বিপণন করছে নোল ফার্মাসিউটিক্যালস। পরীক্ষামূলকভাবে এই ওষুধ প্রয়োগের কাজ চলছে আমেরিকা ও ইউরোপে।

নতুন যুগের সানগ্লাস

পুরুষদের জন্য নতুন যুগের সানগ্লাস ব্ল্যাক বুলেট। এর লেন্স দুটো 'অপটিক স্টিল' নামের এক অদ্ভুত জিনিসে তৈরি, যার শক্তি ইস্পাতের মতো, অথচ কাচের মতোই স্বচ্ছ এবং আলোকীয় গুণাগুণ সম্পন্ন। এই লেন্সে হাতুড়ির আঘাত করলেও লেন্স ভাঙবে না। কারণ অপটিক স্টিল ভীষণ শক্তিশালী, কঠিন অথচ হালকা। এতে কখনও আঁচড়ের দাগ পড়ে না।
ব্ল্যাক বুলেটের লেন্স লেসার পোলারাইজড হওয়ার ফলে চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল দীপ্তি অনেক কমিয়ে দেয়। সুতরাং গাড়ি চালানো, মাছ ধরা, নৌকো বাওয়া—সব কাজেই চোখের ধকল কমিয়ে দেয় ব্ল্যাক বুলেট। এ ছাড়া বিশেষ কারিগরি ডিজাইনের ফলে বিপজ্জনক অতিবেগুনি আলো ও ক্ষতিকর নীল আলোর অনেকটাই ছেঁকে বাদ দিতে পারে অপটিক স্টিল লেন্স।
ব্ল্যাক বুলেট রাখার জন্য রয়েছে প্লাস্টিকের তৈরি আকর্ষক ডিজাইনের বড় মাপের বুলেট আকৃতির বাক্স।

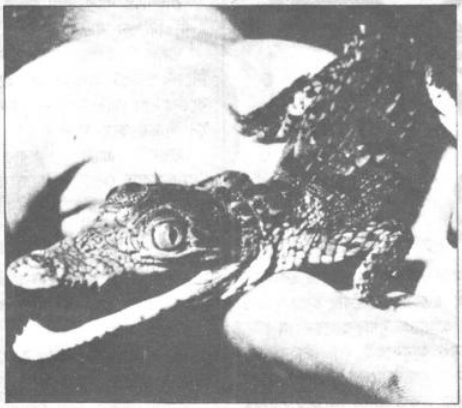

কুমিরের নতুন আশ্রয়

ফ্লোরিডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে সাপের মতো আঁকাবাঁকা কয়েকটি খাল কেটেছিল ফ্লোরিডা পাওয়ার অ্যান্ড লাইট কম্পানি। মোট ১৬৮ মাইল দীর্ঘ এই খাল কাটার উদ্দেশ্য ছিল একটাই : কম্পানির টার্কি পয়েন্ট নিউক্লীয় বিদ্যুৎ-কেন্দ্র থেকে নির্গত গরম জলকে ঠাণ্ডা করা।
তেজস্ক্রিয়তাবিহীন এই খালের জল নাগরিকদের নানা কাজে লেগেছে, তবে এ ছাড়াও উপরি একটা লাভ পাওয়া গেছে। এই খালের বিভিন্ন অংশ লুপ্তপ্রায় আমেরিকান কুমিরের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। মেছো কুমিরের তুলনায় এই জাতের কুমিরের মুখ বেশি ছুঁচলো। আর এরা নোনা জল বেশি পছন্দ করে। টার্কি পয়েন্টের বিভিন্ন খালের নির্জন পাড়ে নিশ্চিন্তে বাসা বাঁধতে পারছে এই কুমিররা। গোটা আমেরিকার আর মাত্র দুটি জায়গাতেই এই জাতের কুমিরের দেখা মেলে। ঘটনাচক্রে এই দুটি জায়গাই রয়েছে ফ্লোরিডাতে : এভারগ্লেডস ন্যাশনাল পার্ক ও কি লার্গোর একটি বিশেষ পার্কে। টার্কি পয়েন্টের খালগুলোর অন্তত ছ' জায়গায় এই কুমিরের আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে অন্তত ১০০টা সদ্যোজাত কুমিরছানার খোঁজ।

এই ব্যাগটি তাঁবুর কাজ করবে, অসুস্থ পর্বতারোহীর

বিগ ব্যাগ তত্ত্ব

তাঁর নতুন আবিষ্কৃত ব্যাগটাকে নিয়ে এভারেস্টের চুড়োয় পৌঁছে গেছেন ইগর গ্যামো।
হাক্সলে পরিবারের মতো এখন গ্যামো পরিবারও বিজ্ঞানের জগতে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন। এই ইগর গ্যামোর বাবা জর্জ গ্যামোই এককালে 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব প্রচলন করেছিলেন।
ইগর গ্যামো অবশ্য বাবার মতো মহাশূন্যের কোনও জটিল আঙ্কিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেননি, তিনি পর্বত-অভিযাত্রীদের জন্য বেশ বড়সড় একটি ব্যাগ আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানী মহলে তাই ঠাট্টাচ্ছলে ইগরের ব্যাগটি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে 'বিগ ব্যাগ থিয়োরি'। এসব রসিকতা সত্ত্বেও ইগরের আবিষ্কারটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ব্যাগটি একসঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ ও তাঁবুর কাজ করবে, উপরন্তু 'মাউন্টেন-সিকনেস'-এর চিকিৎসাতেও কাজ দেবে।
'সি-সিকনেস'-এর মতো মাউন্টেন-সিকনেস শব্দটিও এই মুহূর্তে বহুল-প্রচলিত। পাহাড়ের যত উঁচুতে ওঠা যায়, অক্সিজেনের পরিমাণ ও বাতাসের চাপ ততই কমতে থাকে। এর ফলে রক্তবাহের দেওয়ালগুলির ভেদ্যতা বেড়ে যায়। ফুসফুস ও মস্তিষ্কের মধ্যে জমা হয় বিভিন্ন তরল। এই অসুখের কোনও ওষুধ নেই। অসুস্থ ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়ে আনাই এর একমাত্র নিরাময়।
গ্যামোর ব্যাগটি বায়ুনিরুদ্ধ, ওজনে মাত্র ১২ পাউন্ড। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ এই ব্যাগের মধ্যে টানটান করে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারেন। অসুস্থ লোকটিকে ওই ব্যাগের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়তে হবে। এবার সঙ্গী

আশ্চর্য চিকিৎসা-যন্ত্র

হৃদযন্ত্রের খুঁটিনাটি গোলযোগের সঠিক খবর পেতে চিকিৎসকেরা এখন ব্যবহার করতে পারেন সোনোলাইন। আধুনিক এই চিকিৎসাযন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার হল শব্দোত্তর তরঙ্গ। রুগির দেহের নির্দিষ্ট কোনও অংশ তাক করে পাঠানো হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ। এগিয়ে চলার পথে শরীরের ভেতরের নানা প্রত্যঙ্গ বাধার সৃষ্টি করে। ফলে বাধাপ্রাপ্ত তরঙ্গের প্রতিধ্বনি ফিরে আসে যন্ত্রের গ্রাহক অংশে। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ ফিরে আসে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে। তা থেকেই কম্পিউটার হিসেব কষে বের করে দেয় প্রতিধ্বনির উৎসের গভীরতা কত। সুতরাং তরঙ্গের অভিমুখ ও বাধার গভীরতা, এই দুটি তথ্যের সাহায্যে কম্পিউটার ফুটিয়ে তোলে দ্বিমাত্রিক ছবি। এ ছাড়াও এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় ডপলার এফেক্ট বা ডপলার ক্রিয়া। এর সাহায্যে হেমোডায়ানামিক্স-এর মাপজোখ করা যায়।

সোনোলাইনে শিশুর হৃদরোগের চিকিৎসা

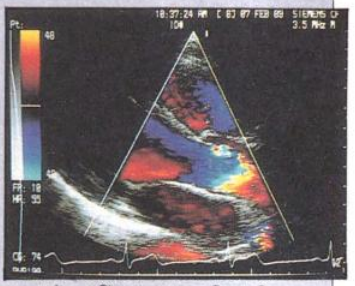

সোনোলাইনের মনিটরে রক্তপ্রবাহের রঙিন মানচিত্র

শব্দতরঙ্গ যদি চলমান কোনও বস্তুকে আঘাত করে প্রতিফলিত হয়ে আসে তা হলে তার কম্পাঙ্কের পরিবর্তন হয়। বস্তুটি যদি তরঙ্গের অভিমুখ থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তা হলে প্রতিফলিত শব্দের কম্পাঙ্ক কমে যাবে, আর বস্তুটি যদি তরঙ্গের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তা হলে প্রতিফলিত শব্দের কম্পাঙ্ক যাবে বেড়ে। একেই বলা হয় ডপলার ক্রিয়া। এই নীতি ব্যবহার করে সোনোলাইন রক্তপ্রবাহের অভিমুখ এবং তার গতিবেগ দুই-ই হিসেব করতে পারে। আর শুধু হিসেব নয়, বিভিন্ন রঙের সাহায্যে টিভি মনিটরে ফুটিয়ে তোলে প্রবাহের নিখুঁত মানচিত্র। রক্তের গতিবেগ যত জোরালো হবে, মানচিত্রে তার রং হয়ে উঠবে ততই গাঢ়। পরিভাষায় যাকে বলে 'কালার ফ্লো ইমেজিং'।

সোনোলাইনের সাহায্যে হৃদযন্ত্র-সংক্রান্ত যে-কোনও মাপজোখ করা যায়। রুগির হার্টের অবস্থা কীরকম, তার কারণ কী কী হতে পারে, সবই চোখের পলকে জানিয়ে দেবে সোনোলাইন। এ ছাড়া সোনোলাইন চাকার ওপরে বসানো, ফলে রুগির কাছে নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে নেই।

চিকিৎসাতেও লাগবে···

পর্বতারোহী ব্যাগের চেন টেনে দেবেন।

চেন টানার পরেও সঙ্গীটির কাজ শেষ হয় না। ব্যাগের সঙ্গে একটি ফুট-পাম্প যুক্ত রয়েছে, পর্বতারোহীকে এবার পা দিয়ে ওই ফুট-পাম্পটি চালাতে হবে। এর ফলে ক্রমশ ব্যাগের ভেতরে বাতাসের চাপ বাইরের পরিবেশের বাতাসের চাপের তুলনায় বেড়ে যাবে।

ব্যাগের ভেতরে শুয়ে থাকা মানুষটির এই সময় মনে হবে তিনি যেন প্রায় চার ফুট গভীর জলের নীচে আছেন। ব্যাগের ভেতরের বাতাসের চাপ যখন বাইরের বাতাসের চাপের তুলনায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দু' পাউন্ড করে বৃদ্ধি পাবে তখন ব্যাগের ভাল্‌ভগুলি খুলে যাবে। এই পাম্পিং-এর ফলে ক্রমাগত বিশুদ্ধ বাতাস ব্যাগের ভেতরে ঢুকবে,কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে যাবে।

এফ-সিক্সটিন, মিগ, মিরাজ—এই নামগুলি আজ অতি পরিচিত। বিমানবাহিনীর ওপরই নির্ভর করে আধুনিক যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি। শ্বাসরুদ্ধকর এই আকাশ-যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন গৌতম চক্রবর্তী

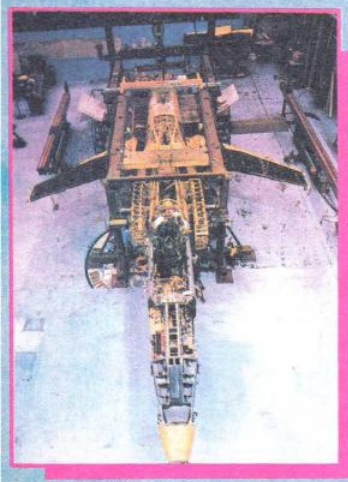

ব্রিটেনের এক কারখানায় তৈরি হচ্ছে 'গ্রুম্মান এক্স' যুদ্ধবিমান

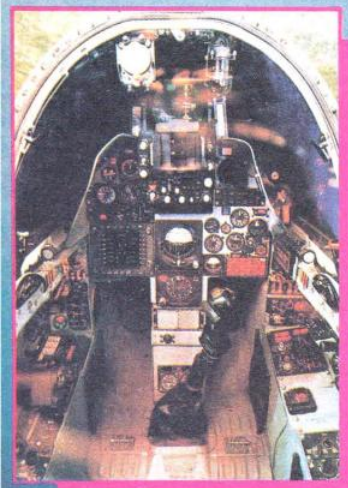

'মিরাজ-থ্রি'র ককপিটের ভিতরের দৃশ্য

কিল ডেভিল-এর উপকূলরক্ষী জন ড্যানিয়েলস স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, পৃথিবীর এক অন্যতম ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবার তাঁর ক্যামেরায় ধরা পড়তে চলেছে। আজ বৃহস্পতিবার। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সাল। সকাল ১০টা বেজে ৩৫ মিনিট। উত্তর ক্যারোলিনার নীলাভ আকাশে এখন স্বচ্ছ, মেঘহীন এক নির্মলতা।

উত্তর ক্যারোলিনার কিটি হক ডেয়ার কাউন্টির চার মাইল দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত আকারের যান। উইলবার ও অরভিল রাইট নামে দুই ভাই এই অদ্ভুত যানটি নির্মাণ করেছেন, তাঁরা এটিকে আকাশে ওড়াতে চান। এই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে থাকার জন্য তাঁরা মাত্র পাঁচজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, উপকূলরক্ষী জন ড্যানিয়েলস তাঁদেরই একজন।

জন ড্যানিয়েলসের হাতে একটি বড়সড় ক্যামেরা, আকাশে ওড়ার এই অদ্ভুত মুহূর্তটিকে তিনি তাঁর ক্যামেরায় ধরে রাখতে চান।

"যদি উড়তে পারি", ককপিটে উঠে বসতে-বসতে অরভিল রাইট বলেছেন, "তা হলেই ছবিটা তুলো।"

হ্যাঁ, ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে জন ড্যানিয়েলস সত্যিই তাঁর ক্যামেরায় ধরে রেখেছিলেন। 'ফ্লায়ার-ওয়ান' নামে রাইট ভাইদের তৈরি সেই অদ্ভুত যান সেদিন আকাশে ৮৫২ ফুট ওপরে উড়ে গিয়েছিল, ৫৯ সেকেন্ড আকাশে কাটিয়ে সেই অদ্ভুত যান আবার পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছিল।

অরভিল ও উইলবার রাইট এক চিরন্তন স্বপ্নের দরজা হঠাৎ খুলে দিয়েছিলেন। আকাশটাকে তাঁরা এনে দিয়েছিলেন মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে। তারপর এক দশক পার হতে-না-হতেই বুদ্ধিমান মানুষ বুঝে ফেলল আকাশকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়, তার একটা মস্ত প্রয়োজন আছে। খুব সহজেই এবার আকাশকে যুদ্ধ এবং ক্ষমতা বিস্তারের কাজে লাগানো যাবে। এখান থেকে বোমা ফেলা যাবে, নিরীক্ষণ করা যাবে শত্রুর গতিবিধি, ধরাছোঁয়ার মধ্যে না থেকেও খুব সহজে গুপ্তচরবৃত্তি করে আবার নিজের

আমেরিকার 'গ্রুম্মান' যুদ্ধবিমানের লম্বা চেহারা ও বিশেষ আকৃতির ডানা এখন শত্রুপক্ষের ভয়ের কারণ

মার্কিন বিমানবাহিনীর ডগলাস জেট

আকাশকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়, তার একটা মস্ত প্রয়োজনও আছে। এখান থেকে বোমা ফেলা যায়, নিরীক্ষণ করা যায় শত্রুর গতিবিধি। ধরাছোঁয়ার মধ্যে না থেকেও খুব সহজে গুপ্তচরবৃত্তি করে আবার নিজের সীমানায় ফিরে আসারও সুবিধা আছে।

রো মা ঞ্চ ক র

বিমান-যুদ্ধ

'এনোলা গে' নামের বোমারু বিমান থেকে হিরোশিমা শহরের বুকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম পরমাণু বোমা। ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি ইরাকের নির্মীয়মান ওসিরাক পারমাণবিক চুল্লির আকাশ লক্ষ্য করে ছুটে এসেছিল কয়েকটি 'এফ-ফিফটিন' বিমান

ডানার নীচে ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভার নিয়ে উড়ে যাচ্ছে 'এফ-ফিফটিন'

সীমানায় ফিরে আসা যাবে। ক্যারোলিনার আকাশে ফ্লায়ার-ওয়ান ওড়ার পর একশো বছরও কাটেনি। তবু, এরই মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত অবধি সবাই বুঝে গেছে, বিমানের প্রয়োজনীয়তা। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। পার্ল হারবার আক্রমণ করে জাপান বুঝিয়ে দিয়েছিল তার শক্তি। ১৮১টা ডাইভিং বম্বার সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হাওয়াই দ্বীপের আকাশে। 'এনোলা গে' নামের বম্বার থেকে হিরোশিমা শহরের ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমা, যার সাংকেতিক নাম ছিল 'লিটল বয়'। দশ বছরও পার হয়নি, ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি ইরাকের নির্মীয়মাণ ওসিরাক পারমাণবিক চুল্লির আকাশ লক্ষ্য করে ছুটে এসেছিল কতকগুলি 'এফ-ফিফটিন' বিমান, সেই বিমানের ছোঁড়া মিসাইলের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল পারমাণবিক চুল্লির স্বপ্ন। ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ি বা কামানও এইসব বিমানের কাছে অতি তুচ্ছ।

ফকল্যান্ডের যুদ্ধে এভাবেই উড়েছিল আর্জেন্টিনীয় যুদ্ধবিমান 'সুপার এতেনদার্দ'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিমান

লিবিয়ার যুদ্ধে বিমানকে প্রথম বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগাল ইতালি। ১৯১১ সালের

২৩ অক্টোবর ক্যাপ্টেন কার্লো পিয়াজা আচমকা একটি বিমান নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন, গোটা লিবিয়াতে শত্রুদের ব্যূহ রচনা আকাশ থেকে দেখতে-দেখতে তিনি আচমকা আক্রমণের একটা ছক কষে ফেললেন। এক সপ্তাহ কাটতে-না-কাটতেই ১ অক্টোবর কর্নেল গুইলো গুইদ্দোত্তি শহরের বুকে বিমান থেকে বোমা ফেলে এলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সেটাই প্রথম 'বম্বিং রেইড'।

হেলিকপ্টারও আকাশ-যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়।

ইতালির এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পর তিন বছর পার হতে-না-হতেই শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তখনও বিমানবাহিনী নামে সেনাবিভাগে বিশেষ কোনও বিভাগ নেই, সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন ও কমান্ডারদের ধারণা শুধুমাত্র আকাশে উড়ে শত্রুপক্ষের অবস্থান, তাদের গতিবিধি, শত্রুদের আচার-আচরণ এসব পরিদর্শন করা ছাড়া উড়োজাহাজ আর কোনও কাজে লাগে না। লিবিয়ার ঘটনার পর জার্মানরাই একমাত্র যুদ্ধে বিমানের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল, ১৯১৪ সালে তাদের সেনাবিভাগেই তখন সবচেয়ে বেশিসংখ্যক উড়োজাহাজ। প্রায় ২৬০টি।

শত্রুব্যূহ পরিদর্শনের কাজে ব্যবহৃত এইসব বিমানে আদৌ কোনও অস্ত্র থাকে না, শুধুমাত্র পাইলটের কাছে রয়েছে একটি ছোট্ট রিভলভার। শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজের সামনাসামনি পড়ে গেলে এই দুই পক্ষই ককপিটের জানলা থেকে একে অন্যের দিকে

কয়েকটি প্রধান যুদ্ধবিমান

দেশ	বিমানের নাম	অস্ত্রবহন ক্ষমতা
সোভিয়েত ইউনিয়ন	মিগ-২১	১। চারটি UV 16-57 রকেট ২। দুটি ৫০০ কিলোগ্রাম ও দুটি ২৫০ কিলোগ্রাম বোমা।
	মিগ-২৯	১। ছটি আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ২। তিনটি রকেট, একটি বন্দুক
	মিগ-৩১	আটটি আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র
	সুখোই-২৭	দশটি আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বোয়িং বি-৫২ এইচ	১। একটি বহু-ব্যারেল বিশিষ্ট ২০ মি·মি· কামান ২। ২০টি ক্ষেপণাস্ত্র
	এফ-সিক্সটিন	১। একটি বহু ব্যারেলবিশিষ্ট ২০ মি·মি· কামান ২। রকেট, বোমা থেকে শুরু করে বিভিন্ন লেসার-গাইডেড ও ইলেকট্রো-অপটিক্যাল মারণাস্ত্র
	গ্রুম্মাম টমক্যাট	১। ৬৭৫ রাউন্ড গুলিসহ একটি রিমোট-কন্ট্রোলড মেশিনগান ২। চারটি আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র
	পি-থ্রি সি	১। দুটি আণবিক বোমা ২। চারটি টর্পেডো
ইংল্যান্ড	হক-২০০	১। ১২০ রাউন্ড গুলিসহ একটি রিমোট কন্ট্রোলড মেশিনগান ২। ৯টি ২৫০ পাউন্ড ওজনের বোমা ৩। ১৬টি রকেট
ইজরায়েল	বি-১ আই· আই লাভি	১। একটি ৩০ মি·মি· কামান ২। ইনফ্রা-রেড এয়ার-টু এয়ার মিসাইল ৩। বোমা ও রকেট
ফ্রান্স	মিরাজ-এফ ওয়ান সি আর	১। একটি অ্যাস্টি-রেডার মিসাইল ২। ৪০০ কিলোগ্রাম লেসার-গাইডেড বোমা
চিন	জিয়ানজিজি-৮	১। একটি ২৩ মি·মি· কামান ২। ইনফ্রা-রেড মিসাইল ৩। রকেট ও বোমা বহনের ব্যবস্থা আছে

চিত্রঃ : নীলাঞ্জন মাইতি

গুলি ছোঁড়ে। মাটিতে যখন ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ি ও কামান নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, তখন আকাশের এই ঘটনাকে নিছক যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

মেশিনগান আবিষ্কারের পর এই আকাশ-যুদ্ধ অনেকটাই সহজ হয়ে গেল।

প্রথমদিকে মেশিনগানটি বসানো থাকত ককপিটে, কিন্তু এর ফলে গুলি ছোঁড়ার ক্ষেত্র (ফিল্ড অব ফায়ার) অনেকটা কমে আসে। তখন প্রপেলারের ঘূরন্ত ব্লেড এড়িয়ে মেশিনগানটিকে বসানো হল বিমানের ওপরের ডানায়। কিন্তু পাইলটের পক্ষে এটি চালানো বেশ শক্ত।

ফরাসি রোঁলা গারোস এই সমস্যার সমাধান করলেন। 'মোরেন-সলনিয়ের এল' মডেলের একটি মনোপ্লেনে তিনি বুদ্ধি খাটালেন। এই প্লেনটির মূল দেহ (fuselage) স্টিম-লাইন্ড ধরনের, প্রপেলার রয়েছে প্লেনের সামনে। প্রপেলারের প্লেটগুলির সঙ্গে গারোস কিছু ইস্পাতের ব্লেড আটকে দিলেন। ঘূরন্ত প্রপেলারে মেশিনগানের গুলি আটকে গেলে এই ব্লেড সেগুলো বের করে দেবে।

ট্যাংকবাহিনীকে আক্রমণে সাহায্য করছে 'হকার সিডনি হ্যারিয়ার' বিমান

মেশিনগান রইল ককপিটের সামনে।
অ্যান্থনি ফকার নামে হল্যান্ডের এক যুবক এরকম যুদ্ধ-বিমান তৈরি করতে তীব্র উৎসাহী, তিনি ব্রিটেনের যুদ্ধ-বিভাগ থেকে কিছু অর্ডার চাইলেন কিন্তু ব্রিটিশরা তাঁকে ফিরিয়ে দিল। হতোদ্যম ফকার চলে এলেন জার্মানিতে।
জার্মানির পক্ষে ফকার এবার পৃথিবীর প্রথম ফাইটার প্লেন তৈরি করলেন। ফকার এফ মনোপ্লেন। প্রপেলারের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যাবে মেশিনগানের গুলি। এক বছরের মধ্যে এই প্লেনগুলি প্রায় ১০০টি ব্রিটিশ ও ফরাসি বিমানকে গুলি করে মাটিতে নামিয়ে দিল।
হতভম্ব ব্রিটিশরা এবার বের করল নতুন মডেলের বিমান 'ডি এইচ টু'। পালটা উত্তর দিতে জার্মানি আকাশে ওড়াল আলবাট্রস। ব্রিটেন এবার নিয়ে এল ভয়ঙ্কর 'সোপউইথ ক্যামেল' বিমান। ১৩০ অশ্বশক্তির রোটারি এঞ্জিন, গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৩৭ মাইল। বিমানের মূল দেহ উটের পিঠের মতো, ককপিট ও তার সামনের অংশে পাশাপাশি বসানো দুটো মেশিনগান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

'মানহাটন প্রকল্প' সাঙ্কেতিক নামের আড়ালে আমেরিকা যেমন একসময় ব্যস্ত ছিল পরমাণু-বোমা তৈরি করতে, বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা বিভাগও সেরকম ব্যস্ত ছিল এক গোপন প্রকল্পে। এই প্রকল্পের নাম 'অ্যাডলারানগ্রিফ'। জার্মান 'লুফ্তওয়েফ' বিমানের মোকাবিলা করার জন্য এই প্রকল্পে বানানো হচ্ছিল 'হারিকেন' ও 'স্পিটফায়ার' নামে ফাইটার-প্লেন।

প্রায় ২৮০০ শত্রুবিমানকে বিধ্বংস করে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছিল এই সোপউইথ ক্যামেল।
পরাজিত জার্মানির হিন্ডেনবার্গ। জয়ের আনন্দে উচ্ছল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উড্রো উইলসন। এই জয়-পরাজয়ের মধ্যে একটা সত্য আজ পরিষ্কার। হয়তো আবার হবে যুদ্ধ, আবার বাধবে ক্ষমতার লড়াই। এবার যার হাতে যত বেশি বিমানবহর, জয় হবে তার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বিমান

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।
ছ' বছরের ব্যবধানে এই দুই সেপ্টেম্বর মাসের মিল কোথায় ?
মিল একটাই, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডের আকাশে ছুটে এসেছিল ঝাঁক-ঝাঁক জার্মান যুদ্ধ-বিমান। শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আর ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে বিমানবাহী জাহাজ ইউ· এস· এস· মিসৌরিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল জাপান। শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

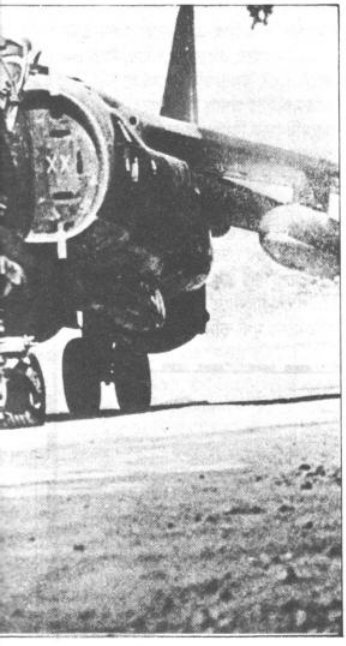

না, বিমান বনাম বিশ্বযুদ্ধের এই সম্পর্কটি আদৌ কাকতালীয় নয়। ফাইটার, বম্বার ইত্যাদি বিমানগুলিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিয়েছিল মূল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। যুদ্ধশেষে এক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব মেলাতে বসে দেখা গিয়েছিল শুধুমাত্র ব্রিটেনের যুদ্ধেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১২৪৪টি জার্মান বিমান ও ৭২১টি ব্রিটিশ বিমান।

পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে অনেক রক্তপাত ঘটেছে, অনেক যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বিমান আবিষ্কারের আগে কোনও বিশ্বযুদ্ধ ঘটেনি। বিমান ও বিশ্বযুদ্ধের এই সম্পর্ক কি শুধুই কাকতালীয় ?

'মানহাটান প্রকল্প' ছদ্মনামের আড়ালে আমেরিকা যেমন একসময় ব্যস্ত ছিল পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে, বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা বিভাগও সেরকমভাবে ব্যস্ত ছিল এক গোপন প্রকল্পে। এই প্রকল্পের নাম 'অ্যাডলারানগ্রিফ'। জার্মান 'লুফ্‌তওয়েফ' বিমানের মোকাবিলা করার জন্য এই প্রকল্পে বানানো হচ্ছিল 'হারিকেন' ও 'স্পিটফায়ার' নামের ফাইটার-প্লেন। এই স্পিটফায়ারগুলি ফাইটার ও বম্বার

এফ-সিক্সটিন বনাম মিরাজ-২০০০

স্পিটফায়ার, হারিকেন...এই বিমানগুলি আজ ইতিহাস। যুদ্ধ-বিমান আজ এসে পৌঁছেছে নতুন এক যুগে, প্রতিরক্ষাখাতে প্রতিটি দেশ আজ একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, আমদানি করছে বিভিন্ন শক্তিশালী বিমান। ঠাণ্ডা-যুদ্ধের এটিই প্রথম ধাপ।

ঠাণ্ডা-যুদ্ধের এই পরিবেশ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশও মুক্তি পায়নি। আমাদের যাবতীয় উৎকণ্ঠা, আগ্রহ আজ দু'রকম বিমানকে ঘিরে। এফ-সিক্সটিন ও মিরাজ-২০০০। কী এদের বৈশিষ্ট্য ? পরস্পরের সঙ্গে এদের পার্থক্যটাই বা কোথায় ? যুদ্ধক্ষেত্রে কার সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ?

এই দুই বিমানকে ঘিরেই এই উপমহাদেশের মানুষের যাবতীয় কৌতূহল। ওপরে : মিরাজ নীচে এফ-সিক্সটিন

মিরাজ-২০০০

ডানার বিস্তার : ৯·১৩ মিটার।
বিমানের দৈর্ঘ্য : ১৪·৫৫।
বিমানের উচ্চতা : ৫·২০ মিটার।
বিমানের চাকার ব্যাস : ৫·০০ মিটার।
বিমানের ওজন (অস্ত্রহীন অবস্থায়) : ৭৫০০ কি গ্রা।
বিমানের ধরন : মাল্টি-রোল ফাইটার।
একজন বৈমানিক বসতে পারেন।
বিমানের সর্বোচ্চ গতিবেগ : ঘণ্টায় প্রায় ১৪৮২ কিমি।
অস্ত্রের পাল্লা : ৯২৫ কিমি অবধি।
অস্ত্রসম্ভার : জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও নিউক্লিয়ার বোমা ছুঁড়তে সক্ষম।
এঞ্জিন : টারবোফ্যান জেট। উর্ধ্বাভিমুখী ঘাতের পরিমাণ প্রায় ২১,৩৮৫ পাউন্ডের সমান।

এফ-সিক্সটিন

ডানার বিস্তার : ৯·৪৫ মিটার।
বিমানের দৈর্ঘ্য : ১৫·০৩ মিটার।
বিমানের উচ্চতা : ৫·০৯ মিটার।
বিমানের চাকার ব্যাস : ৪·০০ মিটার।
বিমানের ওজন (অস্ত্রহীন অবস্থায়) ৮৩১৬ কি গ্রা।
বিমানের ধরন : মাল্টি-রোল ফাইটার।
একজন বৈমানিক বসতে পারেন।
বিমানের সর্বোচ্চ গতিবেগ : ঘণ্টায় প্রায় ১৪৪০ কিমি।
অস্ত্রের পাল্লা : ১৪৮০ কিমি অবধি।
অস্ত্রসম্ভার : জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও নিউক্লিয়ার বোমা ছুঁড়তে সক্ষম।
এঞ্জিন : টারবোফ্যান জেট। উর্ধ্বাভিমুখী ঘাতের পরিমাণ প্রায় ২৩,৪৫০ পাউন্ডের সমান।

দুভাবেই ব্যবহৃত হয়, কোনও-কোনওটি আকাশে ২৫,০০০ ফুট অবধি উঠে যায়। অস্ত্র হিসেবে এগুলিতে থাকে ১০,০০০ পাউন্ড বোমা, ২০ মিমি ব্যাসের দুটো কামান ও চারটে মেশিনগান।
ব্রিটেন যদি স্পিটফায়ার ও হারিকেন বের করে বিমানযুদ্ধে তার কৃতিত্ব দেখিয়ে থাকে, আমেরিকার কৃতিত্ব তা হলে 'লকহিড পি-থার্টি এইট' ও 'নর্থরোপ পি-সিক্সটি ওয়ান' যুদ্ধ-বিমান। নর্থরোপ বিমানটি মুখ্যত রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধ করে, শত্রুবিমানকে অন্ধকারেও খুঁজে বের করার জন্য এতে বিশেষ ধরনের 'রাডার' বসানো রয়েছে। এই ব্যবস্থার নাম ম্যাগনেট্রন। তিনজন বৈমানিক এই বিমানটিকে নিয়ে যখন-তখন 'ডাইভ' মেরে নীচে নেমে আসে, 'লুপ' করে।

ফ্রান্স, ইতালি-জার্মানি যখন একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার জন্য বিভিন্নরকম বিমান তৈরি করতে ব্যস্ত, তখন ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর দূর প্রাচ্যের ছোট্ট দেশ জাপান স্তম্ভিত করে দিল সমস্ত পৃথিবীকে। জাপানি বিমান 'মিৎসুবিসি এ সিক্স-এম জিরো' যখন-তখন ডিগবাজি খেয়ে ওপরে উঠে যায়, নীচে নেমে আসে। এই বিমানগুলিই পার্ল হারবার আক্রমণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকাকে বিধ্বস্ত করল, ডুবিয়ে দিল অদম্য দুই ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স' ও 'রিপাল্‌স'কে।
ব্রিটেনও থেমে থাকেনি। যুদ্ধ শেষ হতে-না-হতেই দেখা নিয়েছিল ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজের ডেক থেকে উড়ে যাচ্ছে কয়েকশো 'ভট এফ ফোর ইউ করসেয়ার'। ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে এই বিমানগুলিই আক্রমণের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

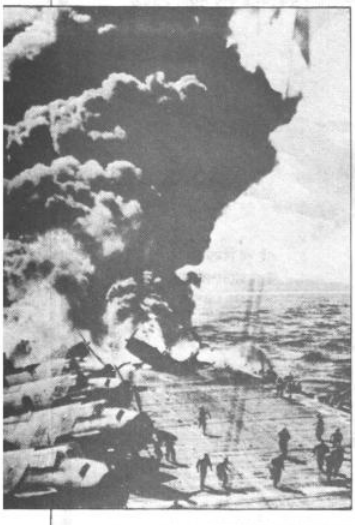

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পার্ল হারবার ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে ব্রিটেনের অন্যতম সামরিক ঘাঁটি। বিশ্বযুদ্ধে জাপান তার সামরিক ক্ষমতা দেখিয়েছিল এই বন্দর ধ্বংস করে। সকাল নটার সময় পার্ল হারবারের আকাশে উড়ে এসেছিল কয়েকটি মিৎসুবিসি বিমান। ১৮১টা ডাইভিং বম্বার। জাপানের বিমান-আক্রমণে সেদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ব্রিটেনের মেরুদণ্ড।

ভারতের বিমানবহর

ভারতীয় বিমানবাহিনী তার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছিল ১৯৮২ সালে। সেদিন তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর।
অবিভক্ত ভারতে, ১৯৩২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে করাচি শহরে জন্ম নিয়েছিল ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম কেন্দ্র। সেদিন ভারতের হাতে বিমান বলতে মাত্র চারটে 'ওয়েস্টল্যান্ড ওয়াপিটি' বিমান।
আটান্ন বছরের ভারতীয় বিমানবাহিনী আজও তার নিজস্ব তারুণ্য হারায়নি। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সে নিজেকে বদলে নিয়েছে, যুগের উপযুক্ত করে গড়ে নিয়েছে। ওই চারটে ওয়েস্টল্যান্ড ওয়াপিটি বিমান আজ ইতিহাস। করাচি শহরও আজ আর ভারতের সীমানার মধ্যে নয়। পুরনো হয়ে যাচ্ছিল বলে 'ক্যানবেরা' নামের বম্বার বিমানগুলিকেও আজ ভারতীয় বিমানবাহিনী বাতিল করে দিয়েছে, সেখানে এসেছে নতুন 'জাগুয়ার' বিমান।
এই মুহূর্তে ভারতীয় বিমানবাহিনীর হাতে আছে কয়েকটি বিশেষ উন্নত ধরনের ফাইটার ও বম্বার। রয়েছে 'হান্টার', 'অজিত', 'মিগ-২১', 'মিগ-২৩', 'জাগুয়ার' ও 'মিরাজ-২০০০'। হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্‌স লিমিটেড-এর দক্ষ বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ারদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে 'মিগ-২১', 'মিগ-২৭' ও 'মিগ-২৯'-এর মতো বিমান। তাঁরাই তৈরি করেছেন 'চেতক' ও 'চিতা'-র মতো হেলিকপ্টার।
ভারতীয় বিমানবাহিনীতে এখন আছে কয়েকটি শক্তিশালী হেলিকপ্টার। 'মি-৮', 'মি-১৭', 'মি-২৬', 'চিতা', 'চেতক' ইত্যাদি এই হেলিকপ্টারগুলির মধ্যে অন্যতম। দুর্গম সিয়াচেন গ্লেসিয়ার থেকে ম্যাকমেহন লাইন অবধি সর্বত্র এই বাহিনীর লোকেরা শ্যেনচক্ষু নিয়ে উড়ে বেড়ান, রক্ষা করেন ভারতীয় সীমান্তের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা।
ভারতীয় বিমানবাহিনী শুধু যুদ্ধ করে না। অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল কয়েকটি মি-৮ হেলিকপ্টার।

মিগ-২৭ এখন ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্যতম হাতিয়ার

নর্থরোপ বি ২-এ : আধুনিকতম বোমারু বিমান

সতেরো জুলাই, উনিশশো উননব্বই। স্থান ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস এয়ার-স্ট্রিপ। এখানেই রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র। এডওয়ার্ডস এ· এফ· বি· এয়ারফোর্স টেস্ট ফ্লাইং সেন্টার। এই ফ্লাইং সেন্টারে সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ। আজ, ১৯৮৯ সালের ১৭ জুলাই এখানকার কর্মী ও পাহারাদারদের সঙ্গে নিঃশব্দে মিশে গেছে মার্কিনি গুপ্তচর সংস্থা সি· আই· এ· ও এফ· বি· আই-এর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় এজেন্ট। মেটাল-ডিটেক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তল্লাশ করা হয়েছে সমস্ত জায়গা। অন্য দেশের গুপ্তচররা যাতে এর কয়েক মাইলের ধারে-কাছে আসতে না পারে।

এয়ার-স্ট্রিপের পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক নিচুস্বরে বিভিন্ন আলোচনা করছেন। এঁদের মধ্যে একজন বিমানবাহিনীর মুখ্যসচিব এডওয়ার্ড আলড্রিজ, অন্যজন বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল ল্যারি ডি· ওয়েলচ। দু' বছর ধরে মার্কিন বিমানবাহিনী একটি নতুন, আধুনিকতম বম্বার প্লেন আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে, আজ সেই প্লেনটি আকাশে উড়বে।

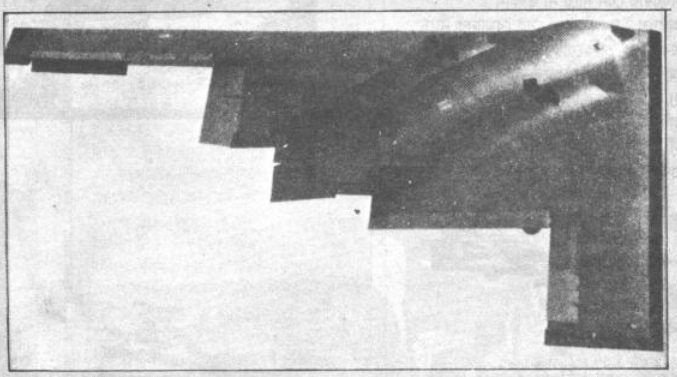

পৃথিবীর আধুনিকতম বোমারু বিমান 'নর্থরোপ বি ২-এ' সেদিনই প্রথম আকাশে উড়েছিল, দু' ঘণ্টা ধরে আকাশে নানারকম কসরত দেখিয়েছিল। নর্থরোপ বি টু-এ বিমানটি তৈরি হয়েছে পুরোপুরি কম্পিউটারের সাহায্যে।

বিমানটির শেষপ্রান্তে কোনও লম্বাকৃতি টেইল নেই, তার পরিবর্তে যেখানে রাখা হয়েছে মারণাস্ত্রের ঘাঁটি। পেছনদিকে নিউক্লিয়ার মিসাইল বা আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে দিতে-দিতে বিমানটি উড়ে বেরিয়ে যাবে। এফ-সিক্সটিন বিমানের এঞ্জিন তৈরি করেছেন যে কম্পানি, এই বিমানের এঞ্জিনও তাঁরাই তৈরি করেছেন। তবে এখানে দুটো এঞ্জিন, দুটোই বিমানের ডানায় রাখা আছে। এঞ্জিনের আকৃতি অত্যন্ত জটিল, একে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এঞ্জিনের সামনে রয়েছে 'জিগজ্যাগ স্লট', এখান থেকে এঞ্জিনে ঠাণ্ডা জলীয় বাতাস প্রবাহিত করা হয় ও সামনের বায়ুস্তরে ইনফ্রা-রেড আলো বিচ্ছুরিত হয়। রাডারে এই বোমারু উড়োজাহাজ ধরা পড়ে না। এখানে রয়েছে রাডার-শোষণকারী পদার্থ।

এই বিমানের ডানার শেষপ্রান্ত একটু বিশেষ ধরনের, আটটি চলনক্ষম গ্রাফাইট-ইপোক্সি প্লেট দিয়ে তৈরি। এঞ্জিনের এগজস্ট-পাইপের শেষপ্রান্তে আরও চারটি ফ্ল্যাপ, বিমান ওপরে ওঠার সময় এরা 'থ্রাস্ট' বা ঊর্ধ্বাভিমুখী বল নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিমানটি যেমন মাত্র একশো ফুট উচ্চতায় উড়ে যাবে, সেরকম ৫০,০০০ ফুট উচ্চতাতেও উড়তে সক্ষম। চোরের মতো চুপিসারে এই বিমান যখন-তখন যে-কোনও উচ্চতায় উঠে পড়বে, রাডারে ধরা না পড়ে বোমা ফেলে পালিয়ে আসবে। এই কারণেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'স্টিলথ বম্বার'।

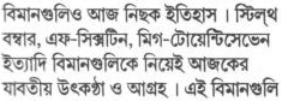

জেট যুগের যুদ্ধবিমান

লকহিড, স্পিটফায়ার, এই বিধ্বংসী বিমানগুলিও আজ নিছক ইতিহাস। স্টিলথ বম্বার, এফ-সিক্সটিন, মিগ-টোয়েন্টিসেভেন ইত্যাদি বিমানগুলিকে নিয়েই আজকের যাবতীয় উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ। এই বিমানগুলি আধুনিক জেট যুগের ধারক ও বাহক। প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য, জেট যুগের আগে বিমানের বেশিরভাগ এঞ্জিন ছিল রোটারি এঞ্জিন, কোথাও ব্যবহৃত হত ইনলাইন কুলিং এঞ্জিন। আর জেট এঞ্জিনে গ্যাস-টারবাইনের প্রবেশপথ দিয়ে বাতাস ঢোকে ও সেখানে সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কুচিত বাতাসকে প্রবাহিত করা হয় জ্বলনকক্ষে, সেখানে জ্বালানি ও সঙ্কুচিত বাতাস একসঙ্গে জ্বালানো হয়। এই গ্যাসের ধাক্কাই প্রপেলারটিকে ঘুরিয়ে দেয়, বিমানটি এগিয়ে যায়। আণবিক বোমা ফেলতে, ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে এইসব জেট বিমানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া, এই আধুনিক বিমানের অস্ত্রসম্ভার-ক্ষমতা পুরনো দিনের বিমানের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। রুশ সীমান্তের আকাশে এরকমই এক জেট বিমান একসময় ঢুকে পড়েছিল, তারপর আচমকা বাতাসের গতি পর্যবেক্ষণ করতে করতে সে পেয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য। বাতাসে ইউরেনিয়াম-এর আইসোটোপের অবস্থান ধরা পড়ছে। সেই বিমানচালকের কল্যাণে পরদিন পৃথিবী জেনে গেল সোভিয়েত রাশিয়া গোপনে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পারমাণবিক বোমার ফর্মুলা তারা জেনে ফেলেছে। মারণাস্ত্রের পাল্লা এখন দু'দিকেই সমান।

যোদ্ধা-বৈমানিকরা কি কখনও আদেশ অমান্য

করেন না ?
করেন। 'এনোলা গে' বিমানের চালক রবার্ট লুইসকে কড়া আদেশ দেওয়া হয়েছিল, 'লিটল বয়' নামের বোমাটিকে হিরোশিমা শহরে ফেলেই যেন তিনি পালিয়ে আসেন। খবরদার যেন নীচে না তাকান।
আদেশ উপেক্ষা করে সেই বৈমানিক নীচে একপলক তাকিয়েছিলেন। তারপরই আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, "মাই গড, হোয়াট হ্যাভ আই ডান !" সহস্র সূর্যের রশ্মিতে দাউদাউ করে জ্বলছে গোটা হিরোশিমা শহর। হ্যাঁ, বিমান থেকেই ফেলা হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমা।

বিশ্বযুদ্ধের পর

পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের পরেও পৃথিবী থেমে থাকেনি। থেমে থাকেনি শান্তির জন্য মানুষের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রচেষ্টা। আবার এসব প্রচেষ্টার পাশে হিংসা, যুদ্ধ চলেছে সমান্তরাল ভাবে। একদিকে তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, অন্যদিকে সামরিক গবেষণাগারগুলিতে তৈরি হয়েছে নাপাম ও হাইড্রোজেন বোমা। একদিকে শান্তি স্থাপনের জন্য পথে নেমেছেন আইনস্টাইন ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো মনীষী। অন্যদিকের ছবিটা একেবারে আলাদা। সেখানে সৃষ্টি হয়েছে ভিয়েতনাম, ইজরায়েল, আরব, নিকারাগুয়া, চিলি, এল সালভাদর। আজও সেখানে যুদ্ধ থামেনি।
১৯৬০ সালের পর থেকেই চিন ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরতে আরম্ভ করে, তা সত্ত্বেও চিনের বর্তমান যুদ্ধবিমানগুলি অনেকাংশে রুশ যুদ্ধবিমানের অনুকরণে তৈরি। চিনের বিমানবাহিনীতে 'জিয়ানজিজি-৬' নামে একটি জেট বিমান এখনও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে, সেটি আসলে রুশ বিমান 'মিগ-১৯'। ওই জিয়ানজিজি বিমানের কারিগরিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়েই তৈরি হয়েছে চিনের আধুনিক যুদ্ধবিমান 'কুইয়ানহিজি-৫'। জিয়ানজিজির তুলনায় এই বিমানের 'ফিউসিলেজ' বা মূল দেহ অনেকটা লম্বা, ফলে এতে অনেক বেশি জ্বালানি ধরে। বিমানের রাডার সামনের দিকে, গতিবেগ শব্দের চেয়েও বেশি (সুপারসোনিক)। ২০০০ কি· গ্রা· বোমা বা মিসাইল বহন

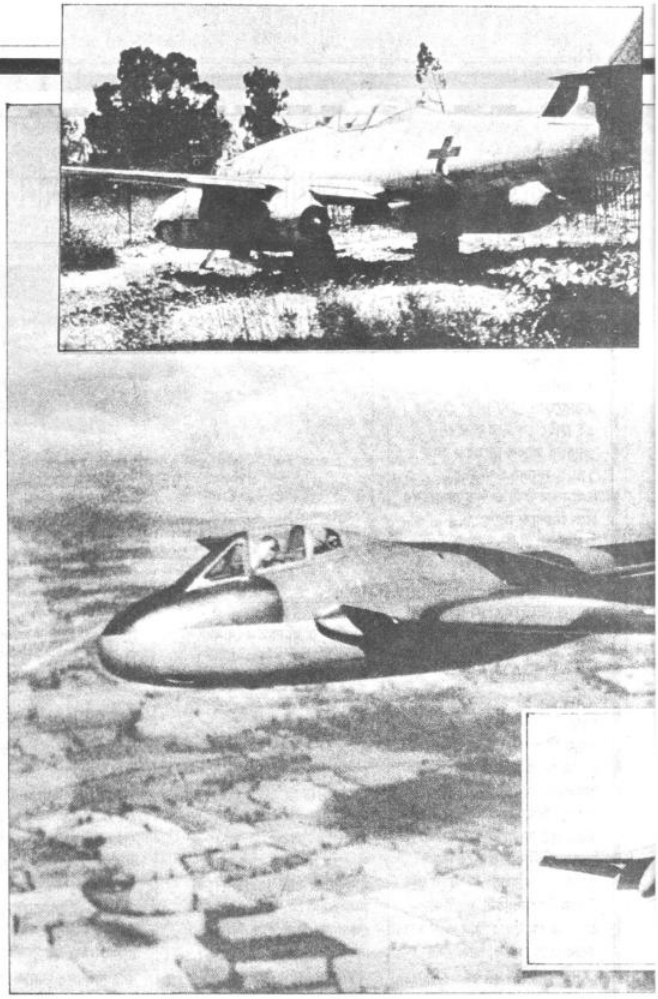

প্রথম ব্রিটিশ জেট ফাইটার 'ডি হ্যাভিল্যান্ড ভ্যাম্পায়ার এফ,' ইনসেট (ওপরে) : প্রথম জার্মান ফাইটার 'মি ২৬২'

করতে পারে এটি। সম্প্রতি চিন এই জাতীয় কয়েকটি যুদ্ধবিমান পাকিস্তানকে বিক্রি করেছে। ন্যাটো (নর্থ অতলান্তিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন)-এর হিসেবমতো এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী বোমারু বিমানবাহিনী আছে রাশিয়ার হাতে। রুশ বম্বার 'তুপোলেভ-২২এম'-এর প্রচলিত নাম 'ব্যাকফায়ার'। বিমানটি পেছনদিক থেকেও শত্রুর অবস্থান বুঝতে পারে, এর শেষপ্রান্তে রাডার-নির্দেশিত দুটো ২৩ মিলিমিটার ব্যারেলের কামান আছে। ন্যাটোর গুপ্তচর-বিভাগের মতে, রাশিয়া এরকম প্রায় চারশোটি বিমান তৈরি করেছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সব যুদ্ধবিমানই তৈরি হয়েছে একটি বিশেষ নীতি নিয়ে। ১৯৪০ সালে প্রধান যুদ্ধবিমান বলতে স্পিটফায়ারকে ধরা হত। একটা স্পিটফায়ার বিমান তৈরি করতে তখন খরচ পড়ত ৫০০০ পাউন্ড। ১৯৮৪ সালের হিসেবে, একটি এফ-সিক্সটিন তৈরি করতে খরচ লাগে ১০ লক্ষ ডলার। ফকল্যান্ডের যুদ্ধে আর্জেন্টিনার যুদ্ধবিমান থেকে ছোঁড়া মিসাইলের আঘাতে তলিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'শেফিল্ড'। ওই বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজটি তৈরি করতে

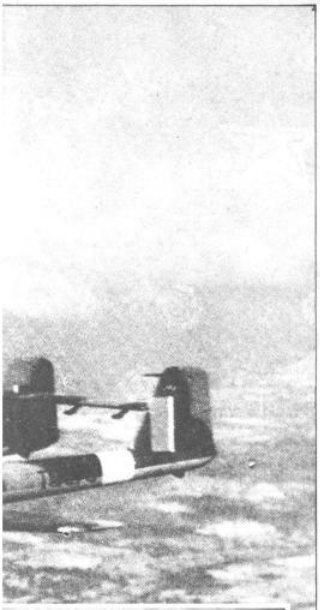

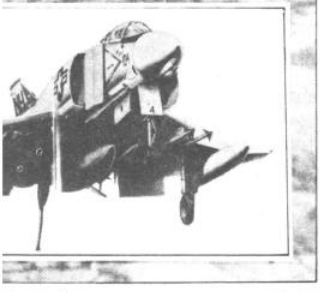

ইনসেট (নীচে) : ম্যাকডোনাল ডগলাস এফ-ফোর বিমান

পৃথিবীতে যুদ্ধই শেষ কথা নয়

যে-কোনও যুদ্ধক্ষেত্রই যে তীব্র রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাময়, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সীমান্তের দু'পাশ থেকে ছুটে আসা ট্যাঙ্ক ও কামানের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ, মুহুর্মুহু গোলা ও বারুদের কানফাটানো গর্জন, চোখধাঁধানো আলোর রোশনাই, ট্রেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠে, ঘন জঙ্গল ভেদ করে চুপিসারে কয়েকজন 'কম্যান্ডো'র এগিয়ে যাওয়া---এ সবই যে দৃশ্য হিসেবে রীতিমত শিহরণজাগানো, অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তব যুদ্ধের ছবিটা অন্য। ওই রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার বাইরে সেখানে আরও বড় একটা জিনিস আছে। সেটা সাধারণ মানুষের হাহাকার। মূল্যবৃদ্ধির আগুনে জ্বলতে-জ্বলতে গোটা দেশের ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া। বাস্তব যুদ্ধে, রণাঙ্গনের বাইরেও আরও অনেক মানুষের আহত আর্তনাদ শোনা যায়। তারা সৈনিক নয়, সাধারণ মানুষ। সার ওয়াল্টার র‍্যালে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের আহত সৈনিকটিকে যে জলের পাত্র এগিয়ে দিয়েছিলেন, সে ঘটনা তো আমাদের সকলেরই জানা রয়েছে। যুদ্ধবাজ হিটলার বা রোমেল কাউকেই ইতিহাস ক্ষমা করেনি। শেষ অবধি দু'জনকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও পৃথিবী তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে নাৎসি জল্লাদদের।

গুয়ের্নিকা : পিকাসোর আঁকা সেই বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী ছবি

যুদ্ধ এরকমই। এক পুরুষ থেকে আর-এক পুরুষে সে ছড়িয়ে দিয়ে যায় রক্তাক্ত প্রতিহিংসার বীজ। সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের দাঁড়াতে হয় বিচারের কাঠগড়ায়, আর সাধারণ মানুষ, দেশ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। ভেঙে দু' টুকরো হয়ে যায় জার্মানি, যুদ্ধে জিতেও শেষরক্ষা করতে পারেনি 'কিলিং ফিল্ডস'-এর কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম। আজও তারা দেশের অর্থনীতিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে ব্যস্ত।

তবু যুদ্ধই শেষ কথা নয়। ইরানের সাম্প্রতিকতম শোচনীয় ভূমিকম্পের পরই ইরাক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়, ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেন ইরানের দিকে বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত।

তখনই প্রমাণিত হয়ে যায়, এই পৃথিবীতে যুদ্ধই শেষ কথা নয়। নিউক্লিয়ার বোমা বা ব্যালিস্টিক মিসাইলও সবকিছু ধ্বংস করতে পারে না, গ্রাস করতে পারে না।

শত যুদ্ধেও মানুষের মনুষ্যত্ব আজও অটুট। আজও তা নষ্ট হয়নি, ফুরিয়ে যায়নি, পচে যায়নি। সেই মনুষ্যত্ব হাতে বেয়নেট ধরতে চায় না, আকাশে সাদা পায়রার ঝাঁক ওড়াতে চায়। মানুষের নিজস্ব সেই মন, হৃদয়, মনুষ্যত্ব কোনওদিনই যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।

ব্রিটেনের খরচ পড়েছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

এই কারণে, বর্তমান যুদ্ধের অস্ত্রগুলি আগেকার দিনের অস্ত্রের চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক। যুদ্ধরত দুই পক্ষই শত্রুর হাতের লুকনো তাসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। শত্রুর ছোঁড়া ব্রহ্মাস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য তার হাতে রয়েছে আরও বড় ব্রহ্মাস্ত্র। একদলের হাতে যদি থাকে ইন্টার রিজিওনাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, অন্যজনের হাতে আছে তা হলে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল। আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে ইজরায়েলের জয়ের অন্যতম কারণ ছিল বিমানযুদ্ধে ইজরায়েলের অসাধারণ দক্ষতা।

মিশরের ঘড়িতে যখন সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট, সেইসময় অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কয়েকটি ইজরায়েলি বিমান। সুয়েজ খালে রাখা মিসাইলগুলিকে এড়ানোর জন্য এই বিমানগুলি উড়ে এসেছিল ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে। প্রথম দলটি বোমা ছুঁড়ে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল বিমানঘাঁটি, সেই আঘাতের রেশ কাটতে-না-কাটতেই অন্যদিক থেকে উড়ে এসেছিল আরও কিছু ইজরায়েলি বিমান। ৮ মিনিট ধরে চলেছিল তাদের বোমাবর্ষণ!

১৯৬৭ সালে সেই যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল ১৯টা ইজরায়েলি বিমান। শক্তিশালী মিশর হারিয়েছিল ৯০টি 'মিগ-২১' বিমান। বিমানযুদ্ধে শক্তিশালী বিমান এবং মিসাইল ছাড়াও আর-একটি অস্ত্র থাকে। তার নাম মানুষ। সেনানায়কের বুদ্ধি, কূটকৌশল, তাৎক্ষণিক চাতুর্য। আধুনিকতম যন্ত্রকে এই বুদ্ধিই নিয়ন্ত্রণ করে। জয়-পরাজয় সবকিছুই কিন্তু আজও ওই মানবিক বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।

গল্প

অমর মিত্র

ম্যাজিক দুরবিন

পারস্যের ম্যাজিক কার্পেট আর দূরবিনের খোঁজ নিতে হলে তোকে খুব বেশি দূর যেতে হবে না পলাশ। এই ধর বাসে ঘণ্টা সাতেক, দুর্গাপুর-বাঁকুড়া পার হয়ে পুরুলিয়ার হাইওয়েতে নেমে পড়তে হবে। জায়গাটার নাম পছন্দপুর, আর লোকটির নাম রহস্যময় পালিত। আমার খুব বন্ধু। আমি তো সেখান থেকে আসছি।"

ঠিক দুপুরে ভবঘুরে পরীক্ষিৎমামা হাজির। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহু দূর ভ্রমণ করে ক্লান্ত। অন্তত চোখ-মুখ তাই বলছে। গোপন উত্তেজনাও আছে। আমি দেখছি। জিনসের প্যান্টে পুরুলিয়ার লাল ধুলো যেন আবিরের মতো ছোপ-ছোপ। মাথার চুলেও তাই। কাঁধের ব্যাগটি নামিয়ে আমাকে প্রায় চুম্বকের মতো টেনে এনে বসিয়েছেন তাঁর সামনে, "শোন পলাশ, যা বলছিলাম।"

মামার চেয়ে আট মিনিটের ছোট আমার মা বললেন, "কোথায় টইটই করে বেড়াচ্ছিস পরি, ক'দিন যে তোর খোঁজই নেই।"

নাম ধরে ডাকায় মামা এখন কিন্তু মুখ ভারী করলেন না, বদলে বিষণ্ণ হেসে বললেন, "টইটই মানে, আমি তো দুর্গাপুর থেকেই ভায়া এলাহাবাদ সাতনা কাটনি ভোপাল হয়ে সুজালপুর চলে যেতাম। কিন্তু টাকা শর্ট পড়ে গেল।"

মামার বিষণ্ণ হাসি, সুজালপুর চলে যাওয়ার কথা আর পারস্যের ম্যাজিক কার্পেট, দূরবিনের কথা একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে আমাদের দু'জনের ভিতরে কৌতূহল জাগিয়ে তুলল প্রবল। সেই সঙ্গে পছন্দপুর, রহস্যময় পালিত। এমন নাম কি ভূ-ভারতে কেউ শুনেছে!

পরীক্ষিৎমামা বললেন, "সুজালপুর যেতেই হবে, আচ্ছা রানি, এ-বাড়িতে রেলের টাইম টেবল আছে না। কলকাতা থেকে ইন্দোর একটা ট্রেন ক'মাস ধরে চালু হয়েছে, শিপ্রা এক্সপ্রেস, ওতে করে যাওয়াই সুবিধে হবে বলে মনে হয়, কবে-কবে যায় শিপ্রা বলতে পারিস, উইকে দু'দিন শুনেছিলাম যেন!"

"কিন্তু মামা, তুমি তো আসল কথাটাই এড়িয়ে যাচ্ছ, ম্যাজিক কার্পেট, দূরবিন, পছন্দপুরের রহস্যময় পালিত, এর সঙ্গে সুজালপুরের কী সম্পর্ক? পুরুলিয়া থেকে তো আসছ?"

মামা বললেন, "আগে এক কাপ চা, বাস জার্নি খুব টায়ার্ড করে।"

মা এবার উঠলেন, "চা চাই তা আগে বলবি তো পরিদা।"

পরীক্ষিৎমামা মায়ের এই 'দাদা' সম্বোধনে হেসে উঠলেন হঠাৎ, "দ্যাখ রানি, তুই কখনও আমাকে দাদা বলিস, কখনও নাম ধরে। তুই আমার চেয়ে আট মিনিটের ছোট, সুতরাং দাদা বলাই উচিত। কিন্তু বাদ দে ওসব। আজ থেকে আমরা বন্ধু হয়ে যাই। বন্ধুত্বের তো ছোট-বড়, বয়সের সম্পর্ক নেই। নাম ধরে যত খুশি ডাক।"

মা হতভম্ব, এ যে ভূতের মুখে রাম নাম।

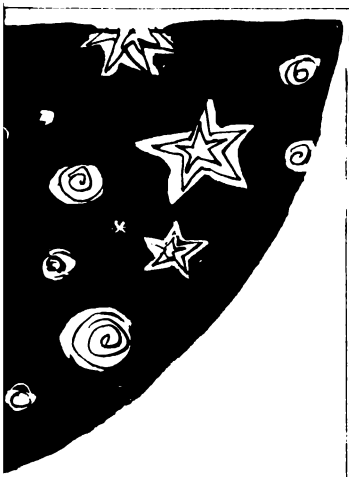

পরীক্ষিৎকে দাদা না বললে ওঁর মুখ হাঁড়ি হয়। বললেন, "এ-চিন্তার উদয় কীভাবে হল ?"

পরীক্ষিৎমামা কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না, বললেন, "সুজালপুরে আমি এক বন্ধুর কাছে যাব। কিরণ মল্লিক, যে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল রহস্যময়ের। রানি, চা নিয়ে আয়। আশ্চর্য এক ঘটনার কথা বলব।"

বাইরে মধ্য-ফেব্রুয়ারির দুপুর। বেশ গরম। জানালা খোলা. মামা ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিঝুম। বিড়বিড় করলেন, "একটা এরোপ্লেন থাকার দরকার নিজেদের। রহস্যময়ের তো ম্যাজিক কার্পেট আছে, উড়ে যেতে পারে, নাহ্, একটা উড়োজাহাজের দর করতে হবে। কোথায় পাওয়া যারে বলো তো ?"

আমি মামার দিকে ঝুঁকে পড়লাম, "সে খোঁজ করা যাবে, কিন্তু তুমি একা-একা পুরুলিয়া ঘুরে এলে, খবরটা পর্যন্ত দিলে না।"

"যাব তো ঠিক ছিল না, হঠাৎ সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম গ্রহণ লাগছে। তখন আর তোকে খবর দিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না পলাশ। তোর অ্যানুয়াল পরীক্ষা তো সামনে। শেষকালে তোর মা হয়তো আমার যাওয়াটাই বন্ধ করে দিয়ে বলত তোকে ইংরেজির টেনসটা যেন আর-একবার দেখিয়ে দিই। তবে গিয়েছিলাম বলেই রক্ষে, না হলে আমার বন্ধু কিরণ মল্লিকের কোনও খবরই পেতাম না।"

কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। মা এককাপ চা আনতে এত দেরি করছেন কেন ? কবে যে পুরোপুরি বড় হব, ইস্কুল ছেড়ে কলেজ, তারপর ব্যাগ কাঁধে আজ জয়পুর কাল উজ্জয়িনী-দিল্লি-আগ্রা··· আমি আর পরীক্ষিৎমামা ছুটছি এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। চা এসে গেছে, দু'কাপ ভাইবোন দু'জনের। মা আর মামা চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, আমি যে কবে এভাবে আয়েশ করে যখন-তখন চা নিয়ে বসতে পারব পুরুলিয়া কিংবা বীরভূম থেকে ঘুরে এসে। পরীক্ষিৎমামা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোর ঠিক কত বয়স হল রে, তাড়াতাড়ি বড় হতে পারছিস না, তা হলে সব জায়গায় আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে···"

আমি চমকে উঠেছি মামার কথায়, "না, না বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয়, সম্পর্কও কোনও ব্যাপার নয়। শোন রানি, পছন্দপুরের রহস্যময় পালিত আমার চেয়ে বছর পনেরোর বড়। এখন প্রায় পঞ্চাশ। তার আসল নাম হল রসময়। ভীমবেটকায় আলাপ হল কিরণ মল্লিকের সঙ্গে। তারপর সে-ই আলাপ করিয়ে দিল রহস্যময়কে।"

"ভীমবেটকা, নামটা যেন শোনা-শোনা !" মা বললেন।

"আসলে ভীম বৈঠকা হবে বোধ হয়, মহাভারতের ভীম অজ্ঞাতবাসের সময় ওই পাহাড়ের কোলে পাথরের উপর বসে ছিলেন। সবটাই কল্পনা, তবে পাহাড়টা তো এখন অন্য কারণে বিখ্যাত।" মামা বলতে-বলতে থামলেন।

হাত তুললাম আমি, "সে তো আমার জানা।"

"তুই জানিস, ঠিক আছে হাত তুললি যখন, আগে বল দেখি।"

"আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্র পাওয়া গেছে তো ওই পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে, ছাদে।"

"গুড, তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখছ মাই ডিয়ার ভাগ্নে।"

মামার কণ্ঠস্বর, বলার ভাষা-ভঙ্গীতেই স্পষ্ট, তিনি আমার জবাবে খুশি। মাও প্রশংসার চকচকে চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি এতে আরও উৎসাহিত। জিজ্ঞেস করলাম, "ভীমবেটকায় যে আলাপ হল রহস্যময় মানুষটার সঙ্গে, তারপর কী হল, সুজালপুর যাবে কেন হঠাৎ ?"

পরীক্ষিৎমামা হাত তুললেন, "ধীরে ভাগ্নে, ধীরে, এত কথা একসঙ্গে বলা যাবে না। ভীমবেটকায় আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিরণ মল্লিকের, সেও গিয়েছিল গুহাচিত্র দেখতে। বাড়ি মধ্যপ্রদেশের সুজালপুর। ইন বিটউইন ভোপাল অ্যান্ড উজ্জেন, প্রবাসী বাঙালি, আদি বাড়ি কাটোয়ায়। সেসব কথা ভুলেই গেছে প্রায়, যেমন হিন্দি বলে তেমনই বাংলা। কোনটা যে ওর নিজের ভাষা তা না বলে দিলে বুঝবে কে। ওর সঙ্গে আমি ভীমবেটকা থেকে গেলাম উজ্জয়িনী। শিপ্রা নদীর তীরে মঙ্গলনাথের মন্দিরের সামনে মোটা কাচের চশমা পরা মাথায় ফেল্ট হ্যাট, প্যান্ট-শার্ট, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ সমেত একটা পাঁচ ফুট হাইটের মানুষকে দেখেই চিৎকার করে উঠেছে কিরণ, "হ্যাল্লো রহস্যময়, মিস্টিরিয়াস রসময়, তুমি এখানে ?"

মা আর আমি ঝুঁকে পড়েছি পরীক্ষিৎমামার দিকে। তিনি তাঁর গল্পের ঝুলি থেকে একটা-একটা করে রঙিন আলোর পাথর যেন বের করতে শুরু করেছেন।

মামা বলছেন, "শোনো পলাশ, শিপ্রা নদীর তীরে ওই মঙ্গলনাথের মন্দির আর রহস্যময় পালিত, এই দুইয়ের ভেতরে যেন একটা গোপন সম্পর্ক আছে। লোকে বলে ওই মন্দিরে নাকি মঙ্গলঠাকুর অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের জন্ম। আমি যতটা জেনেছি। ওখান থেকে আকাশের গ্রহনক্ষত্রকে অবজার্ভ করা যায় খুব চমৎকার। উজ্জয়িনী তো জ্যোতির্বিদের আখড়া ছিল একসময়···"

মা থামালেন মামাকে, "অন্যকথায় চলে যাচ্ছিস, এসব আমি জানি।"

মামা মৃদু হাসলেন, "ঠিক সন্ধে হবে-হবে করছে তখন। সময়টা ধর, আষাঢ় মাস। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে আর থামছে। রহস্যময় পালিত শিপ্রানদীর ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের মেঘের ভেতর দিয়ে তারা দেখার চেষ্টা করছিল। কী অযথা পরিশ্রম বল। কিরণ আমার সঙ্গে আলাপ করানোর পর চুপিচুপি বলল, ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এ বাড়ি। প্রায় ভবঘুরে। লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে তোর লাভ হবে পরীক্ষিৎ। এই কথার পরই কিরণ মল্লিক গিয়ে জাপটে ধরেছে ওকে, 'বন্ধু, আছ কেমন ? তোমার কালেকশন কেমন হচ্ছে ? পারস্য যাবে বলেছিলে, যেতে পেরেছিলে ?'

"রহস্যময় একগাল হেসে বলল, 'দাঁড়াও কিরণ, মঙ্গলগ্রহটাকে অনেকদিন দেখা হয়নি, কী ছাই মেঘ এসেছে যে মহাকবি কালিদাসের দেশে।'

"কিরণ মল্লিক বলল, 'বর্ষাকালে মেঘ আসবে না কী তুমি এসেছ বলে। ক'দিন

ধরেই একটা কথা মনে হচ্ছিল। ধন্দটা দূর করে দাও দেখি।'

"বিচিত্র মানুষটি মাথা নামাল আকাশ থেকে, 'কী ব্যাপার ?'

"'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হল কোথায় বলতে পারো ? কবে, কখন ?'

"গালভরে হাসল রহস্যময়, 'একথা তো আমারও জিজ্ঞাস্য, আমিও ভাবছি কবে তোমাকে, কতকাল আগে প্রথম দেখা হল আমাদের বলতে পারো বন্ধু !'

"শোন পলাশ, এই হল রহস্যময় পালিতের সঙ্গে আমার পরিচয়ের ঘটনা। কিরণ আর রহস্যময় সেই এক ব্যাপারে মত্ত হয়ে থাকল। কিরণ যদি বলে, 'গোয়ালিয়রে আলাপ হয়েছিল,' রহস্যময় বলে, 'না না, মনে হচ্ছে নাগাল্যান্ডের পাহাড়ে।' তাই শুনে কিরণ মাথা নাড়ে, 'নাগাল্যান্ডে আমি গিয়েছি কী কখনও। আমার মনে হয় সুজালপুরেই। তুমি আমার বাড়ি যেবার এলে···।' শুনে রহস্যময় হেসে উঠেছে, 'আরে তোমার বাড়ি গেলাম তো বন্ধুত্ব হওয়ার পর।'"

মা আর পারলেন না, ফস করে বললেন, "তোর এই কিরণ মল্লিকও কম পাগল নয়। কবে আলাপ হল ভুলে গেছে। রহস্যময়ের না হয় পঞ্চাশ হয়ে গেছে, বয়সের কারণে অনেক কথা ভুলেও যেতে পারে।"

মামা মৃদু হাসলেন, "তুই ভুল করছিস, কিরণ মল্লিক হল সেভেনটি টু রানিং।"

"অ্যাঁ !' মা মাথায় হাত দিয়েছেন, 'তুইও কী পাগল হয়েছিস পরি, বাহাত্তর বছরের একটা লোক তোর বন্ধু, তার নাম ধরে কথা বলছিস !"

নিঃশব্দে হাসলেন পরীক্ষিৎমামা, "বন্ধু মানে, এত বন্ধুত্ব বোধ হয় পৃথিবীতে আর কারও মধ্যে নেই, যা আমাদের মধ্যে হয়েছে গত জুলাই মাসে। ওই যে বললাম বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। আমি পঁয়ত্রিশ। রহস্যময় পঞ্চাশ আর কিরণ মল্লিক বাহাত্তর। ভীমবেটকা গুহায় আমি তাঁকে কিরণবাবু বলে ডাকতে তিনি বললেন, 'আমার নাম ধরে ডাকো পরীক্ষিৎ, নাম না ধরলে বয়সের তফাত থেকেই যাবে, রিয়েল ফ্রেন্ডশিপ হবে না।' তখন আমার অবস্থাটা কী বোঝ পলাশ। আমি সম্পর্ক গাঢ় করার জন্য কিরণবাবু থেকে কিরণজ্যাঠা, কিরণমেসো, কিরণদা পর্যন্ত নামতে রাজি ছিলাম। কিন্তু বাহাত্তর বছরের মানুষটার এক গোঁ, বলছে, বয়সটা তো বেড়েই যায় এতে। যদি বন্ধুত্ব হয় তবে কমেছে মনে করতে পারি। দ্যাখ পরীক্ষিৎ, আমার চুল পেকেছে দুটোমাত্র ! খুঁজে বার করতে পারবি না, দাঁত পড়েনি। তোর বরং অনেক চুল এই বয়সেই সাদা হয়ে গেছে···'"

তারপর ! মামা থামলে আমি ঝুঁকে পড়েছি তাঁর সামনে, মনে হচ্ছিল পরীক্ষিৎমামা এবার তাঁর বয়স কমিয়ে আমার সমান করে ফেলবেন খুব তাড়াতাড়ি। তাতে আমার লাভ।

"শোন রানি," মামা বলতে লাগলেন, "বাহাত্তর বছরের ওল্ডম্যান আমার বন্ধু হয়ে গেল ভীমবেটকায়। আর পঞ্চাশ বছরের রহস্যময় পালিতকে পেলাম উজ্জয়িনীর মঙ্গলগ্রহ মন্দিরে। এর পর কিরণ মল্লিক তো ফিরে গেল সুজালপুরে। আমি তিনদিন উজ্জয়িনী থেকে মাণ্ডুর পাহাড়ে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। সঙ্গী হল রহস্যময় পালিত। মাণ্ডুর পাহাড়ে রাজা রাজবাহাদুর এবং রানি রূপমতীর প্রাসাদের ছাদে বসে বহু দূরে একেবারে সরু ফিতের মতো রুপোলি ধারার নর্মদানদীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় পালিত আমাকে হঠাৎ বলল, তার কাছে নাকি একটা ম্যাজিক কার্পেট আছে, আর আছে প্রাচীন দূরবিন, পেয়েছিল জয়পুরে এক ফকিরের কাছ থেকে। ওরিজিন্যাল পারস্য দেশের।"

মা অবিশ্বাসী চোখে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যত্ত সব পাগলের কাণ্ড !"

মামা গম্ভীর, "শোনার ইচ্ছে না থাকলে তো আমি জোর করব না, কিন্তু আমি যা বলছি তার একবর্ণও বানানো নয়। এই তো এলাম পছন্দপুর, পুরুলিয়া থেকে।"

মা বিশ্বাস করছেন না মামার কথা, কিন্তু উঠতেও পারছেন না। গল্পের টান এমন। আমি বেশ জাঁকিয়ে বসেছি। বাইরে বসন্তের বিকেল, যে রোদ্দুরটুকু এতক্ষণ ঘরের মেঝেয় পড়েছিল, উধাও হয়ে গেল যেন ম্যাজিক-গতিতে। হাওয়া আসছিল অতি গোপনে যেন। গল্পের টানে-টানে ভিড় করছে বোধ হয়।

"হ্যাঁ, ওরিজিন্যাল পারস্যের ম্যাজিক কার্পেট আর, আশ্চর্য দূরবিন। কার্পেটে করে নাকি চন্দ্রগ্রহণের রাতে উড়ে যাওয়া যায় আকাশে, আর দূরবিনে চোখ দিয়ে জ্যোৎস্নারাতে প্রিয়জনকে দেখতে পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে, ম্যাজিক কার্পেটের জন্য মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার দরকার, আর দূরবিন হল দু'পক্ষের অন্তরের টানের। যাকে তুমি দূরবিনে দেখতে চাও, সেও যেন হাজার মাইল দূর থেকেও সেই মুহূর্তে তোমার কথা

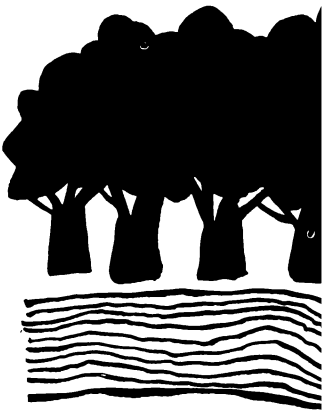

ভাবে। এই না হলে হবে না।"

"এগারো তারিখে পূর্ণগ্রহণ ছিল না ?" আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি।

"হ্যাঁ, ওইদিনই তো আমি পছন্দপুর যাই। কিন্তু ব্যাড লাক, গ্রহণের দিনে পৌঁছতে পারিনি। আমাকেও যেন রাহুতে ধরেছিল।"

মা ফট করে বললেন, "ধরেছিল কেন, রাহুতে ধরে রেখেছে এখনও। তুই এসব পাগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিস ?"

মামা এবার রাগলেন না। একটু বিষণ্ণ হয়ে বললেন, "বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব, তাতে পাগলের কী ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, পরস্পরকে আমরা পাগলের মতো ভালবাসি।"

আমি কথা ঘোরাই, "তা হলে ম্যাজিক কার্পেটে উড়তে পারোনি ?"

"না, পারিনি। আমার সত্যিই ব্যাড লাক। স্টেটবাস মাঝরাস্তায় বিগড়ে গেল। সন্ধেয় পৌঁছনোর কথা যেখানে পছন্দপুর, পৌঁছলাম পরদিন সকালে, রাস্তায় গাড়ি বিগড়ে থাকল, আর ওদিকটার যাতায়াতের ব্যবস্থা এত খারাপ, স্টেটবাস ছাড়া গতি নেই। দিনে তিনখানা, আমাদেরটাই ছিল শেষ বাস। আমার তখন কী অবস্থা। ড্রাইভার, কন্ডাক্টর একটা ধাবায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। প্যাসেঞ্জার ছিল যারা, তারা সব কাছের, হাঁটতে লাগল নিরুদ্বেগে। বুঝলাম, এ-ব্যাপার প্রায়ই হয়, এতে তারা অভ্যস্ত।"

মা হাসলেন, "বাস ওই গুলবাজটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই বিশশতকের শেষে ম্যাজিক কার্পেটে করে ওড়া, দূরবিনে প্রিয়জনকে দেখা। তুই কী করে বিশ্বাস করলি ?"

"বাহ্ !" মামা ভোলেভালে গলায়

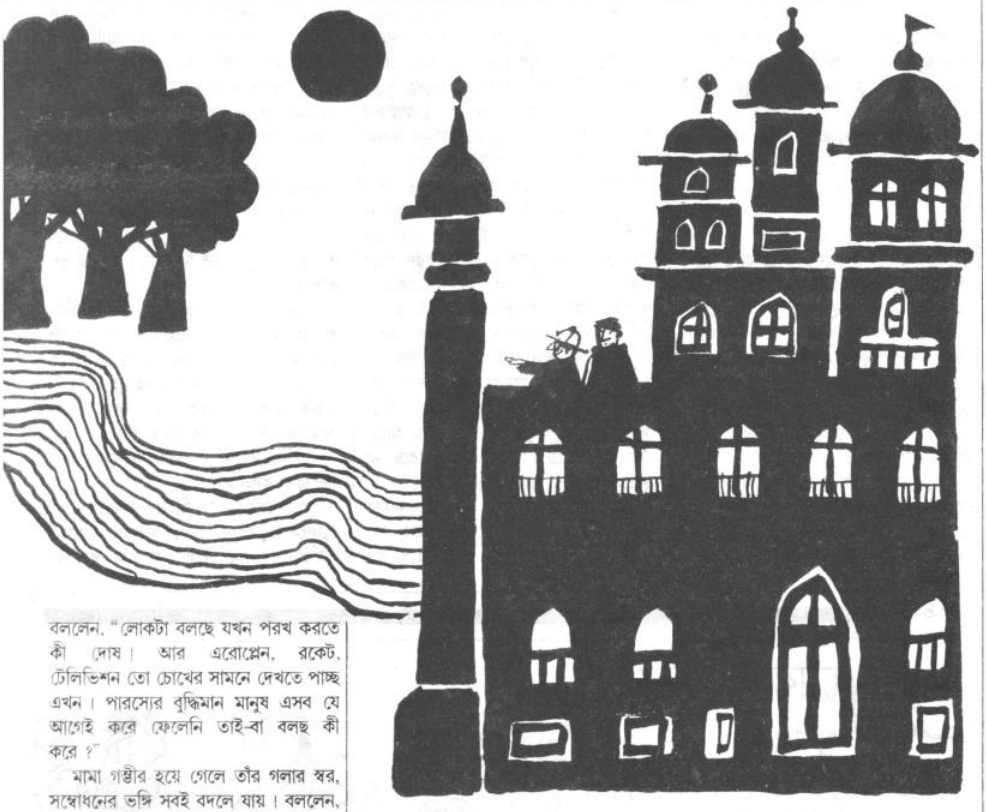

বললেন, "লোকটা বলছে যখন পরখ করতে কী দোষ। আর এরোপ্লেন, রকেট, টেলিভিশন তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ এখন। পারসোর বুদ্ধিমান মানুষ এসব যে আগেই করে ফেলেনি তাই-বা বলছ কী করে?"

মামা গম্ভীর হয়ে গেলে তাঁর গলার স্বর, সম্বোধনের ভঙ্গি সবই বদলে যায়। বললেন, "তোমাদের না হয় শুনতে হবে না···"

"না না, আমি শুনব।" আমি চেপে ধরেছি মামার হাত।

পরীক্ষিৎমামার মুখের হাসি ফিরে এল আবার, "তোর মাও শুনবে। পৃথিবী থেকে রূপকথা মুছে গেছে নাকি। শোন রানি, যখন পছন্দপুরের রহস্যময় পালিত ম্যাজিক কার্পেটে চেপে সুজালপুরে চলে গেছে কিরণ মল্লিকের কাছে, তখন আমি জঙ্গলের ধারে সেই হাইওয়ের ধাবার খাটিয়ায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছি কীভাবে পৃথিবীর ছায়া ক্রমশ চাঁদকে ঘিরে ফেলছে। সম্পূর্ণ কালো হয়ে অদৃশ্য হচ্ছে উপগ্রহটি। এত খারাপ লাগছিল যে বলবার নয়। পরদিন সকালে আর-একটা বাসে করে রহস্যময় পালিতের বাড়ি পৌঁছতে বেলা দশটা। গিয়ে কী দেখলাম জানিস?"

"কী?" আমি অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করেছি।

"লোকটা ঘুমোচ্ছে, তার সঙ্গী একটা সাঁওতাল যুবক। সে বলল, 'সারারাত জাগা ছিলেন বাবু। এখন ঘুমোচ্ছেন, আপনি বিশ্রাম নিন। কাল এলেন না কেন? গ্রহণ দেখতে পারতেন।'

"বাড়িটা খুব পুরনো। ভাঙাচোরা জমিদারবাড়ি। তার অর্ধেক ঘরেই তালা মারা। উঠোনে ঝোপজঙ্গল। কেমন যেন অদ্ভুত স্তব্ধতা বাড়িটার চারধারে। একটা পাখির ডাকও শুনতে পেলাম না। আমিও সারারাত জেগে শুধু আঙুল কামড়ে গ্রহণ দেখেছি! বিছানায় শুয়ে একটু গড়িয়ে নেব ভাবলাম। কিন্তু ঘুম এল না। ঘুমোব কীভাবে? আমি তো ম্যাজিক কার্পেটে আর দূরবিন দেখতে এসেছি। সত্যি কথা বলেছে, না সবটাই মিথ্যে। কিন্তু তা হলে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে কেন রহস্যময় পালিত। সাঁওতাল যুবকটি বলল, 'বাবু কাল বাড়ি ছিলেন না রাতে। কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন।' হ্যাঁ, ভোরবেলা দেখা গেল ছাদ থেকে নামতে, তার বাবু খুব ভাল মানুষ। গুণী মানুষ। কার্পেট! না সে দ্যাখেনি, বাবুর মুখে শুনেছে, ম্যাজিক কার্পেটে করে হুস্! বাবুর কথা সব সত্যি।

"বেলা একটা নাগাদ সাঁওতাল যুবকটি আবার ডাকতে এল আমায়। রহস্যময়বাবু ঘুম থেকে উঠেছেন। খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি, ডাইনিং টেবিলে রহস্যময় বসে। মাথায় হ্যাট, একেবারে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি। পরে জেনেছি, হ্যাট-প্যান্ট তার সর্বক্ষণের সঙ্গী, পোশাকে দুর্গন্ধ না হলে সে ছাড়ে না। বর্ষায় আর শীতে মাথায় জল দেয় না।

"আমাকে দেখে সোল্লাসে হাত বাড়াল রহস্যময়, 'কথা ছিল না পরীক্ষিৎ, গ্রহণের দিনে আসবি। কাল অপেক্ষা করে-করে শেষে আমি একাই উড়ে গেলাম সুজালপুর। মনটা ভাল নেই একদম, কী যে করি!'

"কেন মন খারাপ তা বলল না রহস্যময়। সারাদিন শুধু গল্প করে গেল জয়পুর চিতোরগড়, রতলম, গোয়ালিয়র আর সাঁচির। আমি যত বলি কার্পেট আর দূরবিনটা দেখাও রহস্যময়। সে শুধু মিটিমিটি হাসে, বেড়ালের মতো ম্যাঁও করে, শেষে বিকেলে বলল, 'ম্যাঁও মানে না, সংস্কৃতে 'মা' শব্দ তো 'না'ই বোঝায়। হ্যাঁ শোন পরীক্ষিৎ, কার্পেটটা তো পৃথিবীর বাতাস লাগায় শুধু চন্দ্রগ্রহণের দিনে, নতুবা ওর ম্যাজিক নষ্ট হয়ে যাবে, তবে হ্যাঁ, দূরবিনটা দেখতে পাবি চাঁদ উঠলেই।'

"'কার্পেটটা চোখের দেখা দেখা যাবে না?' আমি স্পষ্টত হতাশ।

"মাথা নাড়ে রহস্যময়, 'না পরীক্ষিৎ, তা হলে ওর শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আয় ছাদে যাই, চেষ্টা করে দেখি, কিরণ আমাদের কথা ভাবছে কি না তা জানতে।'

"সন্ধের পর চাঁদ উঠল একটু দেরিতে। কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়ে গেছে কিনা! দূরের পাহাড় জঙ্গল ক্রমশ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে জ্যোৎস্নায়। রহস্যময় ছাদের কুঠরি ঘর থেকে বের করে আনল সেই ম্যাজিক দূরবিন। বেশ বড় সাইজের, অনেক পুরনো তা দেখলেই বোঝা যায়। গায়ে বিচিত্র সব কারুকাজ। রহস্যময় আমার হাতে দিয়ে বলল, 'ওরিজিন্যাল পারসিক ম্যাজিক টেকনোলজির। আয় পরীক্ষিৎ, চোখে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, কিরণ তোর কথা ভাবছে কি না। কাল সন্ধেয় হঠাৎ মনে পড়তে আমি কিরণকে দেখলাম এই দূরবিন দিয়ে, ক'দিন আগে খবরের কাগজে একটা সংবাদ দেখেছিলাম, তাই মন একটু উতলাও ছিল। কিরণ আমাদের বন্ধু হলেও তো ওল্ডম্যান। কাল ওকে দূরবিন দিয়ে দেখলাম। খুব অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে আছে, তবে জ্ঞান আছে। আমার কথা ভাবছে, না ভাবলে দেখতে পাব কেন?'"

কথা বলতে-বলতে পরীক্ষিৎমামার মুখমণ্ডল ভারী হয়ে এসেছে। কেমন যেন থরথর করে কাঁপছেন তিনি। আমার গায়েও শিহরন। আশ্চর্য! পারস্যের এমন এক দূরবিন, ম্যাজিক কার্পেটের কথা আমি গল্পে পড়েছি না! সেই তিন রাজপুত্তুর তিনটে আশ্চর্য জিনিস আনতে ছুটলে বিদেশ-বিভুঁই। একজন পেল দূরবিন, একজন কার্পেট, একজন আপেল। দূরবিনে চোখ দিয়ে এক রাজপুত্তুর দেখল রাজকন্যা নূরনেহার রোগে পাণ্ডুর হয়ে শুয়ে আছে পালঙ্কে। তখন অন্য রাজপুত্তুর ম্যাজিক কার্পেট পাতল, তাতে করে উড়ে গেল তিনজন। আপেল খেয়ে রাজকন্যে উঠে বসল বিছানায়। আমার বুক কাঁপছে···।

"শোন পলাশ, রহস্যময় তার চশমাটি আমার হাতে দিয়ে প্রথমে চোখ রাখল দূরবিনে, তারপর মাথা নেড়ে আমাকে দূরবিনটা ফেরত দিয়ে বলল এই মুহূর্তে কিরণ মল্লিক তার কথা বোধ হয় ভাবছে না। আমাকে চোখে দিতে বলল।"

"তুমি দেখলে?" আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মামা বললেন, "আমি ওর চশমাটা ছাদের আলসেতে রেখে চোখ দিলাম পারস্যের দূরবিনে। চোখ দিয়ে মনে-মনে বললাম,

কবিতা

আচমকা ঘুম ভেঙে

সুনীল বসু

আচমকা ঘুম ভেঙে হল খুব দুঃখ,
দেখলুম হয়ে গেছি আলুথালু রুক্ষ।
মজে থেকে স্বপ্নের আঁটসাট মউতাতে,
কোথা যেন খেতে গেছি কার বিয়ে বউভাতে।
মনে নেই কার বাড়ি কোথা সেই রাস্তা,
দিচ্ছিল জিবে-গজা কচুরি সে খাস্তা।
বলছিল ক'টি লোক দিতে হবে এখুনি,
গরম গরম ভাজা লুচি পুরি বেগুনি।
অথবা যা দিল্লিতে গিয়ে আন লাড্ডু,
অঙ্কেতে যারা পায় গোটা-গোটা গাড্ডু।
তারা খায় কষে খুব ছাতু আর পেস্তা,
ভুলে গেছি জমিদারি কোথা সে সেরেস্তা।
খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল পান্তুয়া চমচম,
এমন সময় এল চেপে এক টমটম।
পাঞ্জাবি বুড়ো লোক হাতে তার ডালমুট,
খাচ্ছিল ক্রিম দেওয়া মুচমুচে বিস্কুট।
একজন চাপরাশি হাতে তার সন্দেশ,
আমাকেও দিল খেতে বালুসাই দরবেশ।
দিল হেসে লাল এক বাড়ি ভেঙে সুরকি,
গালে দিয়ে দেখি সে-ও চিনি মাখা মুড়কি।
স্বপ্নেই হচ্ছিল এইসব কাণ্ড,
কে যেন হাঁকল জোরে কোথা কুষ্মাণ্ড।
কুষ্মাণ্ডতে খুব ভাল হয় ছ্যাঁচড়া,
সেরে যায় চুলকুনি আর খোস-পাচড়া।
খাস যদি যম-তিত উচ্ছেকে দৈনিক,
রক্তের চাপ কমে বল পাবি দৈহিক।
খাওয়া-দাওয়া আজকাল হয় খুব স্বপ্নে,
যদি লাগে খুব ভাল বেগুনির টোপ নে।
ছেড়ে দিলে একেবারে সব কিছু ভোজ-টোজ,
স্বপ্নের গোলমালে খাবি খাবি রোজ রোজ।

ছবি : দেবাশিস দেব

'কিরণ, আমার প্রিয়তম বন্ধু, তুমি আমার কথা একটু ভাবো। আমি তোমাকে দেখব একবার এই দূরবিনের ভেতর দিয়ে। তুমি নাকি অসুস্থ হয়ে...'

"কিন্তু না। দেখতে পেলাম না, সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানিস, দূরবিনটা মনে হল ভাঙা, ভেতরে একটা লেন্সও নেই। আমি শুধু দুটো তারা দেখতে পেলাম ঘুলঘুলি দিয়ে। কিন্তু তা সাদা চোখে দেখার মতোই, রাগ হয়ে গেল খুব, লোকটা একনম্বর ঠগ। একটা ভাঙা কমদামি দূরবিন দেখিয়ে কত কথাই না বলেছে, চোখ বের করে ওর কলার ধরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিতে যাব কিন্তু থমকে গেলাম। কী হল রহস্যময়ের ? রহস্যময় মাটিতে কী যেন খুঁজছে অন্ধের মতো। হাতড়াচ্ছে যেন জ্যোৎস্নার কণিকা। টের পেল আমি ওর দিকে ফিরেছি। বলল, 'আমার চশমাটা একটু খুঁজে দে তো পরীক্ষিৎ। চশমা ছাড়া একদম দেখতে পাই না, তুই রাখলি কোথায় ?'

"লোকটা একদম অন্ধ। সত্যিই তাই। মোটা কাচওয়ালা চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। আমার কেমন কষ্ট হল। ছাদের আলসে থেকে চশমাটি তুলে ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'তুমি খালি চোখে দূরবিনে কী আর দেখবে বলো, আর এই দূরবিনের তো একটা লেন্সও নেই।'

"'দেখতে পেলি না ?'

"হা হা করে হাসলাম, 'দেখা যায় কি সত্যি ?'

"হাতে চশমার ডাঁটি ধরে প্রায় অন্ধ রহস্যময় বোঝাতে লাগল আমাকে, 'শোন পরীক্ষিৎ, তুই তো ভুল করছিস, এ তো মায়া-দূরবিন। লেন্স আছে কিন্তু তা ভেসে উঠবে তখনই যখন তুই দেখতে পাবি তোর প্রিয়জনকে, তোকে যদি না ভাবে কিরণ, তুই তাকে দেখবি কীভাবে। দে দেখি, দূরবিনটা আমি আর একবার দেখি।'"

"তারপর ? থামছিস কেন পরি বলে যা।" মা চেপে ধরেছেন ভাইয়ের হাত।

পরীক্ষিৎমামা বাইরের অন্ধকারে তাকালেন। এর ভেতরে যে সন্ধে হয়ে এসেছে তা আমরা টের পাইনি। ঘর অন্ধকার রইল। আলোর সুইচ টিপতে কেউ উঠলাম না।

পরীক্ষিৎমামা বিড়বিড় করলেন, "শোন পলাশ, তারপর অন্ধ রহস্যময় পালিত তার শূন্য চোখে ধরল সেই ভাঙা মতো দূরবিন। চোখ দিয়ে কয়েক সেকেন্ড পরই চিৎকার করে উঠল, 'ওই তো কিরণ, জ্ঞান ফিরেছে।

জ্ঞান ফিরতেই আমাকে ভাবছে, পরীক্ষিৎ, আমি দেখতে পাচ্ছি, ও জ্ঞান হারিয়েছিল। শোন, এবার ঘটনাটা শোন, ওর একটা ছেলে বড় বিজ্ঞানী ছিল, আরব সাগরে প্লেন পড়ে গেল ক'দিন আগে, জ্বলন্ত ওই প্লেনের যাত্রী ছিল সেই বিজ্ঞানী নিরঞ্জন মল্লিক। শোনার পর থেকে ও জ্ঞান হারাচ্ছে। বুকে ব্যথা উঠেছিল ওর, বড় রকমের হার্ট অ্যাটাক। আহা রে,এত কষ্ট পাচ্ছে আমাদের ওল্ড ম্যান বন্ধু। সমুদ্রে তার ছেলে পড়ে গেল জ্বলতে জ্বলতে।'"

মা এবার অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। "হ্যাঁ, একটা প্লেন তো পড়ে গেছে, দিন-আটেক আগে খবর ছিল,টিভিতে দেখাল। কিন্তু যে লোকটা অন্ধ, চশমা ছাড়া কিছুই দ্যাখে না, সে এসব বলতে লাগল, সত্যি বলতে লাগল ?"

পরীক্ষিৎমামা মাথা নত করলেন, তারপর চাপা ফিসফিসে গলায় বললেন, "ওটাই তো রহস্যময় ব্যাপার। মনে-মনে, অন্তরে-অন্তরে যোগ হলে নাকি ওই যন্ত্র দিয়ে সত্যিই দেখা যায় দূরের মানুষকে। একে-একে দুই হলেই তবে সচল হয়ে ওঠে ওই পারস্যের দূরবিন। নতুবা ওটা একটা ধাতব সিলিন্ডার মাত্র। কানাকড়িও দাম হবে না ওর। আমি অনেকবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। কতবার বললাম, 'কিরণ, তোমাকে দেখতে চাই, একবার ভাবো আমার কথা, ওল্ডম্যান, আমি তোমার ইয়ংগেস্ট ফ্রেন্ড।' কিন্তু দেখা গেল না ওকে, ও বোধ হয় শুধু ভাবছিল রসময় রহস্যময়ের কথা।"

"তুই আমাদের দেখতে চেষ্টা করলি না কেন ?"

মামা বিষণ্ণ হাসলেন, "ওই জ্যোৎস্নায় ছোট-ছোট টিলাপাহাড়ঘেরা পছন্দপুরে শুধু কিরণ মল্লিকের কথা মনে পড়ছিল, তার ছেলেটি দুর্ঘটনায় মারা গেল। বড় ইচ্ছে হচ্ছিল কিরণকে দেখার, কলকাতার মানুষকে তো দেখতে পাবই, দূরবিনের দরকার নেই তো তার জন্য।"

"তা হলে তুমি এখন কী করবে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মামা অন্ধকারে ফিসফিস করলেন, "সুজালপুর যাব, গিয়ে দেখি কিরণ কেমন আছে। পুরনো কাগজটা খুঁজে নিয়ে আয় দেখি, প্লেন দুর্ঘটনার খবরটা আর-একবার পড়ে নিই, ও খবরটা কিন্তু সত্যি বলেছে রহস্যময়, ওই প্লেনে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, নিহত বিজ্ঞানীর নাম নীলাঞ্জন মল্লিক।"

মা নিঃশব্দে উঠে গেছেন। আমি আর পরীক্ষিৎমামা এখন অন্ধকারে পরস্পরের মুখোমুখি। আমি বললাম, "ম্যাজিক কার্পেটটা দেখা গেল না তা হলে ?"

"না দেখা হোক, কিরণের খবরটা তো পেলাম। আর ওই রহস্যময় পালিত কিরণ মল্লিককে খুবই ভালবাসে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিরণও ওকে তেমনই ভালবাসে, তা আমি দেখেছিলাম উজ্জয়িনীতে। ভালবাসে বলেই না রহস্যময় কিরণকে দেখতে পাচ্ছিল।"

"মনে-মনে !" আমি ফিসফিস করলাম, "অন্ধও তো মনে-মনে দ্যাখে।"

মা আমার কথার মাঝে ঘরে ঢুকে আলোর সুইচ দিলেন। আলো জ্বলতেই দেখি মামা দু'হাতে মুখ ঢেকে। মা টাইমটেবিলটা বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন মামা কখন মুখ তুলে তাকান।

ছবি দেবাশিস দেব

কেরিয়ার গাইড

হোটেল ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রি কোর্স

আমাদের দেশে হোটেল এবং কেটারিং ম্যানেজমেন্ট-এ ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর জন্য অনেকগুলি সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেই তুলনায় হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি কোর্স পড়ানোর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি নেই। মণিপালের ওয়েলকাম গ্রুপ গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কর্নাটকের দক্ষিণ কানাড়া জেলায়, ভারতের পশ্চিম উপকূলে মণিপাল এক সুন্দর প্রাকৃতিক শহর। পশ্চিমে আরব সাগর এবং পুবে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, এইরকম সুরম্য পরিবেশে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। মণিপাল যেন পুরোপুরি ইউনিভার্সিটি টাউন। এখানে ডঃ টি· এম· এ· পাই ফাউন্ডেশনের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। মেডিসিন, এঞ্জিনিয়ারিং, ডেনটিস্ট্রি, ফার্মাসি, ল, এডুকেশন, আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—শিক্ষাক্ষেত্রে এইসব প্রতিষ্ঠানের দেশজোড়া সুখ্যাতি। ক্যাম্পাসে হাজার-চারেক ছাত্র সব সময় গমগম করছে। এসব ছাত্রের মধ্যে বিদেশী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়; মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে প্রায় কুড়ি শতাংশ।

গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

হোটেল এবং কেটারিং শিল্পের উত্তরোত্তর চাহিদার কথা মনে রেখে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে ডঃ টি· এম· এ· পাই ফাউন্ডেশন হোটেল ম্যানেজমেন্টের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। প্রথমে কলেজটির নামকরণ করা হয়েছিল 'কলেজ অব হোটেল অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট'। ১৯৮৭ সালের অগস্ট মাসে এই কলেজের শিক্ষার মান এবং হাতে-কলমে শেখার সুযোগ বাড়ানোর জন্য ওয়েলকাম গ্রুপ হোটেলের সঙ্গে সংযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এদের প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন পেয়েছে। এজন্যই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ করা হয়েছে, 'ওয়েলকাম গ্রুপ গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'।

হোটেল এবং কেটারিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মণিপালের ডঃ টি· এম· এ· পাই ফাউন্ডেশন।

(১) এখানে হোটেল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স (বি এইচ এম) পড়ানো হয়।

(২) এই পাঠক্রম ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। কোর্স শেষে ডিগ্রি দেওয়ার দায়িত্ব ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের।

(৩) দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা হোটেল স্কুলগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানকার পাঠক্রম তৈরি করা হয়েছে।

(৪) এখানকার প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি পেয়েছে।

(৫) হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক মানের হোটেল রয়েছে।

কী কী কোর্স পড়ানো হয়

ওয়েলকাম গ্রুপ গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোটেল ম্যানেজমেন্টে তিন বছরের ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স পড়িয়ে থাকেন। এই কোর্স ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। সুতরাং এই পাঠক্রম শেষ করার পর সফল ছাত্রছাত্রীদের ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি দিয়ে থাকেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

তিন বছরের এই ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে প্রি-ইউনিভার্সিটি অথবা দ্বাদশ শ্রেণী অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা যে-কোনও শাখার ছাত্রছাত্রীই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন।

কীভাবে মনোনয়ন হয়

যেসব প্রার্থী নির্ধারিত নম্বর পেয়ে আবেদনপত্র পাঠাবেন তাঁদের একটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসতে হবে। উপরন্তু 'গ্রুপ ডিসকাশন'-এ অংশ

নিতে হবে। এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয় নতুন দিল্লি, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মণিপাল এবং কলকাতায়। এই পরীক্ষা থেকে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত পর্যায়ে মণিপালে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল জানানো হয় ডাকযোগে।

সিলেবাস ও অন্যান্য কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোটেল স্কুলগুলোর পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই কলেজের তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। ছ'টি সেমিস্টার জুড়ে মোট ছত্রিশটি কোর্স পড়ানো হয় এখানে। পাঠক্রমের মধ্যে দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন 'ভ্যালি ভিউ

ইন্টারন্যাশনাল' হোটেলে হাতে-কলমে কাজ শেখানো হয়। এ ছাড়া সারা দেশে ওয়েলকাম গ্রুপের হোটেলে কাজ শেখার সুযোগও আছে।

বিশেষ করে পাঠক্রম এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে হোটেল-শিল্পের ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক শেখানো হয়। একজন ছাত্র এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর যাতে হোটেল বা রেস্টুরেন্টের সমগ্র প্ল্যানিং, সুপারভিশন এবং কন্ট্রোল বিষয়ে দক্ষ হতে পারে তার সবরকম চেষ্টা করা হয়। ক্যান্টিন কিংবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেটারিং পরিচালনা বিষয়েও শেখানো হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ এবং হাতে-কলমে কাজ শেখার পর কোনও শিক্ষার্থীর পক্ষে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। কোর্সের মধ্যে আছে ইংরেজি, ফরাসি, খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন, খাদ্য ও পানীয় তৈরি, আপ্যায়ন, ঘর সাজানো, অর্থনীতি ও রাশিবিজ্ঞান, বাণিজ্যিক আইন, হিসাবশাস্ত্র, ব্যবস্থাপক সংস্থার নীতি, কর্মী ব্যবস্থাপনা, বিপণন এবং বিভিন্ন প্রোজেক্ট ওয়ার্ক।

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে

প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন পঞ্চাশটি ঘরের এক বিশাল হোটেল রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের কাজ শেখানোর

সুবিধের জন্য। ১৯৬৯ সালে ভ্যালি ভিউ ইন্টারন্যাশনাল তৈরি হয়েছিল একটি আদর্শ হোটেল হিসেবে ; এখন খাদ্য পরিবেশনা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের জন্য ভ্যালি ভিউ একটি মডেল ট্রেনিং হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে।

ক্যাম্পাসের মধ্যেই রয়েছে সুন্দর লাইব্রেরি, ল্যাব-কিচেন এবং নানা উন্নত জাতের আধুনিক অডিও- ভিসুয়াল যন্ত্রপাতি।

এ ছাড়া আবাসিক এই কলেজ ক্যাম্পাসে নাটক, বিতর্ক, আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতা, খেলাধুলোর আদর্শ পরিবেশ রয়েছে।

নিঃসন্দেহে এইসব কাজকর্ম ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য করে। ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকেও কর্তৃপক্ষ নজর রাখেন। সমস্ত ছাত্রছাত্রীই এখানে 'মেডিক্লেম' স্কিমের আওতায় পড়েন। এ ছাড়া মণিপালের হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্য পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রছাত্রীদের অবসর বিনোদনের জন্য একটি টিভি লাউঞ্জ সহ বিনোদন-কক্ষের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পরিশেষে জানাই,আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি ইনস্টিটিউট অব কেটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন স্থাপিত হয়েছে হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর জন্য। এ ছাড়া বিভিন্ন ফুড ক্র্যাফট ইনস্টিটিউটও রয়েছে।

কীভাবে আবেদন করবেন

প্রার্থীকে নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন জানাতে হয়।

ডাকযোগে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে মার্চ মাসের প্রথমদিকে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চাশ টাকার পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে নিয়মাবলী এবং আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট 'ডঃ টি· এম· এ· পাই ফাউন্ডেশন'-এর অনুকূলে কাটতে হবে।

পূরণ করা ফর্ম পঞ্চাশ টাকার পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট সহ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দিতে হয়। এই পঞ্চাশ টাকা নেওয়া হয় রেজিস্ট্রেশন এবং পরীক্ষার ফি বাবদ। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ কলকাতায় লিখিত পরীক্ষা এবং গ্রুপ ডিসকাশন পরীক্ষা নেওয়া হয়। বাঙ্গালোর বা বোম্বাইতে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় সাধারণত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। প্রার্থী কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক আবেদনপত্রে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এই পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের জুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ মণিপালে ফাইনাল ইন্টারভিউ দিতে হয়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মনোনীত প্রার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশন করে ফি জমা দিতে হয়।

নাম নথিভুক্ত করার আগে ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে এলিজিবিলিটি বা যোগ্যতার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়। এর জন্য যোগ্যতা-নির্ণায়ক অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিটের প্রত্যয়িত নকল এবং 'ম্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি'র অনুকূলে কাটা পঞ্চাশ টাকার পোস্টাল অর্ডারসহ রেজিস্ট্রার, ম্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি, শপিং কমপ্লেক্স, মঙ্গলাগঙ্গোত্রী-৫৭৪ ১১৯ এই ঠিকানায় আবেদন জানাতে হবে। নিয়মাবলী, আবেদনপত্র কিংবা ভর্তি-সংক্রান্ত অন্যান্য যোগাযোগের জন্য পত্রালাপ করতে হবে

অধ্যক্ষ
ওয়েলকাম গ্রুপ গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,
ভ্যালি ভিউ,
মণিপাল-৫৭৬ ১১৯, কর্নাটক
এই ঠিকানায়।

ছবি : দেবাশিস দেব

ক্যাম্পাস

রুশ-ভারত খুদে শিল্পীদের ছবি

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সারদা দেবী স্কুল অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট এবং সোভিয়েত দেশের কালিনিনগ্রাদসকা স্কুল অব গ্রাফিক আর্টস-এর কিশোর-কিশোরীদের একটি চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। সোভিয়েত দেশের তিনজন শিক্ষক এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁদেরই একজন আন্দ্রেই-র সঙ্গে ছিল ওদেশের শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি। প্রদর্শনীতে ছবি ছিল মোট ৮০টির মতো। কলকাতার কিশোর-কিশোরীদের আঁকা ছবির সংখ্যা ৩০টি এবং সোভিয়েত দেশের ছিল ৫০টি ছবি। দু' দেশের কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতের চমৎকার মিল ছিল এই প্রদর্শনীতে। বিষয়বস্তুর কথা ভাবলে এ-প্রদর্শনীতে রাখা ছবিগুলি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের কল্পনার জগতে প্রকৃতি, রূপকথা ও নগর জীবন বেশি করে ফুটে উঠেছে। তবে সোভিয়েত দেশের মিহাইলভ সাসার ৩৭ নম্বর ছবিটি আমাদের দেশের মৎস্যকন্যার কথা বেশি করে মনে করায়। হয়তো আমাদের দেশের মৎস্যকন্যার কথা ওদেশেও আছে। এদেশের কিশোর-কিশোরীদের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ওদের কিশোর-কিশোরীদের আঁকা প্রকৃতি এক নয়। তবুও শিল্পীদের কল্পনার

যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পীদের আঁকা ছবিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যে গাছপালার, ঘাসের গায়ে বরফের কুচি অথবা সমস্ত প্রকৃতিই যেন বরফ গায়ে মেখে আছে। রং ব্যবহারের পার্থক্য চোখে পড়ে। কলকাতার কিশোর-কিশোরীদের ছবিতে প্যাস্টেল, জল রঙের ব্যবহারই বেশি। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার খুদে শিল্পীরা ব্যবহার করেছে তেল রং, কখনও মিশ্র রং,কখনও কাগজের ওপর মোম লাগিয়ে তারপর রং চড়িয়ে পরে মোম তুলে দিয়েছে। রাশিয়ার শিল্পীদের কিছু ছবিতে এরকম মিশ্র রঙের এবং মাধ্যমের ব্যবহার একটু বেশি পরিপক্ক মনে হয়। প্রদর্শনীতে তাই শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ভিড় ছিল বেশি। সোভিয়েত দেশের খুদে শিল্পীরা জানতে পারলে কী খুশিই হবে যে, তাদের বয়সী দর্শকরাই এ-প্রদর্শনীতে ভিড় জমিয়েছে সবচেয়ে বেশি।

অশোককুমার কুণ্ডু

মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দক্ষিণ কলকাতার একটি নামী স্কুল তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন। বেশ বড়সড় বাড়ি নিয়ে স্কুলটি তৈরি। ছাত্রসংখ্যাও কম নয়। খুব ভাল লাগল ছাত্রদের শৃঙ্খলাবোধ, শুধু পড়াশোনাতেই নয়, খেলাধুলো, ছবি আঁকা এবং নানারকম হাতের কাজে এই স্কুলের ছোট-ছোট ছেলেরা ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং স্কুলের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে (নার্সারি ও প্রাথমিক বিভাগের) ছাত্রদের নিয়ে স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা শ্রীমতী দীপ্তি সিন্‌হা পুরস্কার প্রদান ও একটি মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। যে-সমস্ত ছাত্র স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ভালভাবে কৃতকার্য হয়েছে, তাদের পুরস্কার দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। পুরস্কার প্রদান করেন শিক্ষক শিক্ষণ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দৃশ্য *ফোটো : রবীন্দ্রনাথ কাজি*

মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৃণালিনী দাশগুপ্তা। এই অনুষ্ঠানে ছোট-ছোট ছেলেরা কেউ কথক নৃত্য পরিবেশন করে, কেউ পরিবেশন করে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবার কেউ হাস্যকৌতুক। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল বেশ জমজমাট। খুব ভাল লাগল ক্লাস ওয়ানের ছেলে সুব্রত রায়ের নৃত্য। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সলিলচন্দ্র লাহিড়ি ও সহ-সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের দিবা বিভাগের প্রধানশিক্ষক শিবনাথ দে।

কাজল চক্রবর্তী

Amela-4 (8.8.90)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

এই দেশ এই বিশ্ব

এসেলওয়ার্ল্ড কি ভারতের প্রথম ডিজনিল্যান্ড

বোম্বাইয়ের কাছে মনমাতানো এসেলওয়ার্ল্ড । লিখেছেন **বিকাশ চক্রবর্তী**

এসেলওয়ার্ল্ডের মনমাতানো রঙিন প্রবেশপথ

এই মজার গাড়ি চালাতে কোনও লাইসেন্স দরকার নেই

রামধনু-নাগরদোলায় চড়ে আকাশ ছোঁয়ার মজা

রোলার-কোস্টারে চড়ে যুবকেরাও মজার অংশীদার

এক অদ্ভুত পৃথিবী !
গাড়িটার আকৃতি বেশ মজার, রঙিন, ছোট্ট এক টয় ট্রেনের মতো দেখতে । পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে সেটা আস্তে-আস্তে বেশ নির্বিঘ্নে ওপরে উঠে যাচ্ছিল ।
তারপরই হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা । আচমকা মনে হল, পৃথিবীটা দুলছে । ভয়াবহ কোনও ভূমিকম্পে পায়ের নীচের মাটিটা আস্তে-আস্তে সরে যাচ্ছে, ট্রেনটাকেও কোনওমতে আর রুখতে পারা যাচ্ছে না । হুড়মুড় করে সেটা পাতালে নেমে যাচ্ছে, আর একটু পরেই হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে !
অদ্ভুত এক পাতাল পৃথিবী !
শরীরটা এখনও অক্ষত, চারদিকে কমলা, নীল, সবুজ অদ্ভুত সব রং । সেইসব রঙের মধ্যে আমরা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি ।
একটু পরেই আবার সেই রঙিন পৃথিবী দূরে

সরে গেল।
ভূমিকম্প ? দুর, সেই ছোট্ট টয় ট্রেনেই তো বসে আছি। এই তো, চারপাশে পরিচিত স্ন্যাক্স-বার, প্রাণোচ্ছল মানুষের ভিড়। এই তো সেই সবুজ গোরাই পার্ক !
অদ্ভুত এই পৃথিবীর নাম 'এসেলওয়ার্ল্ড' (Esselworld)। ভেঙে বললে পুরো কথাটা হচ্ছে এডুকেশন স্পোর্টস অ্যান্ড সায়েন্স একজিবিশন ল্যান্ড। বিজ্ঞান আর মজা, পড়াশোনা আর খেলা যে পৃথিবীতে মিলেমিশে একাকার !
বরিভালি স্টেশনে নেমে ফেরিতে করে পেরিয়ে যেতে হবে গোরাই খাঁড়ি। তারপর, বাসে মাত্র এক কিলোমিটার ! সবুজে ঢাকা, সঙ্গীত আর আনন্দের কলকোলাহলে ভরা আশ্চর্য এক পৃথিবী।

মন ভোলানোর হরেক সম্ভারের একটি

> এসেলওয়ার্ল্ড তৈরি করেছেন সুভাষচন্দ্র নামে এক মারাঠি যুবক। সতেরো বছর ধরে এই যুবকটি ডিজনিল্যান্ড গঠনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। ঘুরে এসেছেন পৃথিবীর ন'টি দেশ। দেখেছেন ৪২টি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। আজ তিনি সফল।

অঙ্কের হিসেবে এই পৃথিবীর আয়তন অনেকখানি। প্রায় ৭৫৩ একর।
খাতায়-কলমে হয়তো এটাই ভারতের প্রথম জাদুনগরী বা প্রথম 'ডিজনিল্যান্ড'। তবু, অঙ্কের হিসেবে অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। বাকি থেকে যায় আনন্দ, মজা, উত্তেজনা !
যেমন, কখনওই প্রকাশ করা যায় না 'জাইক্লোন' বা 'ডজেম'-এর উত্তেজনা ! জাইক্লোনের গাড়িটাও দেখতে বেশ মজার, সবসুদ্ধু চারজন সেখানে বসতে পারে। একটা খাড়া পথ বেয়ে আস্তে-আস্তে গাড়িটা ওপরে উঠতে শুরু করে। আর তারপরই হঠাৎ মনে হয়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বোধ হয় আচমকা লোপ পেয়ে গেছে। প্রচণ্ড বেগে গাড়িটা ঘুরতে শুরু করেছে, অদ্ভুত এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সেটা সহসা ওঠানামা শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, আমার শরীরে কোনও ওজন নেই, এই ভাসমান শরীরটা এখনই গাড়ির বাইরে ছিটকে বেরিয়ে যাবে ! দু' চোখ বন্ধ করে মনে-মনে ঈশ্বরের নাম জপ করতে শুরু করেছি, আর তারপরই গাড়িটা আচমকা এক ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেছে। কোথায় মাধ্যাকর্ষণ লোপ ? কোথায় সেই অনন্ত মহাশূন্যের ভারহীনতা ? আমার চারপাশে ঝলমলে পৃথিবী সেই চিরপরিচিত এসেলওয়ার্ল্ড !
প্রাণপণ শক্তিতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়েও কেউ গাড়ির গতি রোধ করতে পারছে না। কোনও না কোনওভাবে রাস্তার মোড় ঘুরতে গিয়ে ঠিক তিন-চারটে গাড়ির মুখোমুখি দেখা হয়ে যাচ্ছে, গাড়িগুলি দুমদাম করে একে অপরকে গিয়ে গোত্তা মারছে।
আহতদের আর্তনাদের কোনও ব্যাপার নেই, প্রতিবার গাড়িগুলি গোত্তা খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হো-হো করে অবিমিশ্র উল্লাস আর হর্ষধ্বনি সমস্ত জায়গাটা কাঁপিয়ে দিচ্ছে।
এটা এসেলওয়ার্ল্ড। এই গাড়ির চালক হতে পারে যে কেউ, কারও বয়স ছয়, আবার কারও বয়স ষাট। গোত্তা না খেলে, অন্য গাড়িতে ধাক্কা না মারলে তবেই তো জিত।
মিশরের স্ফিংক্স আর আফ্রিকার গহন অরণ্যের জুলু সৈন্য থেকে শুরু করে লন্ডনের বিগবেন, গ্রিনল্যান্ডের বরফ আর ইগলু সব কিছুই চলে এসেছে হাতের মুঠোয় !
এসেলওয়ার্ল্ডের এই অংশের নাম রিভার কেভ্স। এককথায় নদীর গুহা।
প্রাণটা হাতে নিয়ে চেপে বসতে হবে একটা ছোট্ট নৌকোয়। ঝরনার নীচে এক সুড়ঙ্গ বেয়ে নৌকোটা এবার তরতর করে এগিয়ে যেতে থাকবে। সেই সুড়ঙ্গের পাশে বিভিন্ন দেশ। বিভিন্ন তাদের প্রকৃতি, বিভিন্ন তাদের রূপ।
একসময় দেখা যাবে, ঝরনার ধারে ঘন জঙ্গল। পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, লম্বা-গলা জিরাফ বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দেশের নাম আফ্রিকা !
জঙ্গল ছাড়িয়ে একসময় সুড়ঙ্গ বেয়ে এসে পড়লাম অদ্ভুত এক দেশে। চারদিকে ধুধু বালি, মরুভূমি। ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা খেজুরগাছ। মরুভূমি পেরিয়ে দূরে এক পাথরের বিবর্ণ অদ্ভুত মূর্তি—আধা মানুষ আধা সিংহ। সাহারা মরুভূমি ছাড়িয়ে আমরা এখন চলেছি মিশরের দিকে।
এসেলওয়ার্ল্ডে দাঁড়িয়ে আকাশ ছোঁয়াটাও খুব একটা কম আনন্দের নয়। অদ্ভুত এক নাগরদোলার নাম 'রামধনু' বা 'রেনবো'। এই অদ্ভুত নাগরদোলায় একটা সেতু রয়েছে, তার রং আকাশী-নীল। কিছুদূরেই আছে এক সূর্য।
আছে রক-ও-প্লেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে নাগরদোলা, ভেতরটা মধ্যযুগের টর্চার চেম্বার বা অত্যাচার কক্ষের মতো দেখতে। একসময় নাগরদোলা ঘুরতে শুরু করে।
এই নাগরদোলা এসেলওয়ার্ল্ডের নাগরদোলা। মনে হবে ঘরটা হঠাৎ দুলছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে, সাঁ করে সরাসরি এক অন্ধকার গহ্বরে নেমে যাচ্ছে।
অদ্ভুত পৃথিবীতে তো বেশিক্ষণ থাকা যায় না, একসময় সত্যিই বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এই ধুলোময়লা থেকে সেই 'জিপার ডিপার' আর জাইক্লোনের দূরত্ব কিন্তু খুব বেশি নয়।

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

ভূতের গল্প

ভুতুরে গাড়ির যাত্রী

কণা বসু মিশ্র

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। যেন বিশাল একটা হিমবাহ গলে-গলে পড়ছে। জানুয়ারির শীতলতম রাত। শহরটা সারা গায়ে বরফের গুঁড়ো মেখে অন্ধকারে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। পটকা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন দিকে যে ছুটছে হুঁশ নেই। বোধ হয় কাকঝোরার দিকে। কারণ, পরদিন সকালে ওই কাকঝোরার কাছেই হিলকার্ট রোডের ওপর ওর জ্ঞান ফিরেছে কিনা।

ওই সময় দার্জিলিং যেতে পইপই করে বারণ করেছিলেন মা। কিন্তু যেখানে নিষেধ সেখানেই যে পটকা। তা ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে ও বাজিও ধরেছিল, শীতের সঙ্গে লড়াই করে তবেই কলকাতা ফিরবে। চট করে দার্জিলিং মেলের একখানা রিজার্ভেশন পেতেও ওর কোনও অসুবিধে হয়নি। কেননা, ভিড়টা তখন কলকাতামুখী। শীতের দেশে শীতের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। দলে-দলে লোক পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে সমতলভূমির দিকে।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা অটো নিয়ে পটকা সোজা চলে যায় শিলিগুড়ি বাস টার্মিনাসে। তখন সন্ধে সাতটা হবে। লাক্সারি বাসগুলো পর পর দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ আগেই নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। সাতটার পর পাহাড়গামী সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ। নেহাত বাঘের বাচ্চা না হলে কেউ এ সময় দার্জিলিং আসে ? পটকা নামের দিক থেকে ছেলেমানুষ হলেও সে এখন রীতিমত সাবালক। ওই নামটার ওপরে পটকার মোহ তো নেইই, বরং দারুণ রাগ। পৈতৃক সম্পত্তি অনেকেরই থাকে না। কিন্তু পিতৃদত্ত ভাল একটা নাম পাওয়ার অধিকার তো সকলেরই থাকে ? এই কৈফিয়ত যিনি দিতে পারতেন, তিনি পটকার বাবা। অনেকদিন আগেই স্বর্গারোহণ করেছেন। পটকার মা কলেজে পড়ান। পটকা স্কুলের বারো ক্লাসের গণ্ডি ডিঙিয়ে সম্প্রতি কলেজে ঢুকেছে। তাই উঠতি বয়সের চ্যালেঞ্জটা ওর যেমন আছে, তেমনই আছে দুর্গমকে জয় করার নেশা। পটকার মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সটাও করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মায়ের এক ছেলে হওয়ার যা জ্বালা ! মা কিছুতেই চান না, ছেলে তেনজিং নোরগে হোক, কিংবা এডমন্ড হিলারি।

পটকা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে যদি কোনও ল্যান্ডরোভার ভাড়া পাওয়া যায়। খিদের জ্বালায় ওর পেটের মধ্যে ছুঁচো দৌড়চ্ছে। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষণ্ণ মনে পায়চারি করতে থাকে বাস টার্মিনাসে। তারপর ফুটপাথের চায়ের স্টল থেকে এক খুরি চা নেয় আর দুটো বিস্কুট। পটকা চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁট ছোঁয়াতেই দ্যাখে, একজন নেপালি ড্রাইভার একটা খালি ল্যান্ডরোভারের স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। ভাঁড় ফেলে দিয়েই পটকা চৌ-চৌ দৌড়। ও আবদারের ভঙ্গিতে বলে, "দাজু ! তোম দার্জিলিং মে জায়গা ? হামকো লে চলো ?"

ড্রাইভার বলে, "কিতনা ফগি ওয়েদার ! হাম ক্যায়সা যায়গা ?"

কিন্তু পটকা নাছোড়বান্দা, "তোম কিতনা রুপোয়া মাঙতা হ্যায় ?"

ড্রাইভার হাসে। পান খাওয়া লাল ছোপের হাসি। বলে, "বহুত ঠাণ্ডি হ্যায়। রুপেয়া তো জাদা দেনা পড়ে গা।"

পটকা বলে, "কই বাত নেহী হ্যায়। জরুর দেগা।"

ও ড্রাইভারের চোখের সামনে চারখানা একশো টাকার নোট বাগিয়ে ধরে। টিউশনির টাকায় পটকার পকেটটা বেশ গরম। সেইসঙ্গে মাও কিছু ট্রাভেলার্স চেক দিয়ে দিয়েছেন, দার্জিলিঙের ব্যাঙ্ক থেকে পটকা যাতে ভাঙিয়ে নিতে পারে। চারদিকে ছিনতাই, ডাকাতি যে পরিমাণ হচ্ছে, তাই ক্যাশ টাকা ওকে বেশি সঙ্গে নিতে দেননি মা। পটকা টাকাটা বাগিয়ে ধরেই ভাবে, কাল রোববার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। ড্রাইভার ছোঁ মেরে নোটগুলি কেড়ে নেয়। পটকা মনে-মনে বিড়বিড় করে, 'মাটি টাকা, টাকা মাটি।'

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পটকা একলাফে উঠে বসে ড্রাইভারের পেছনের সিটে। স্টার্ট দিতেই গাড়ির এঞ্জিন গর্জে ওঠে। রাস্তার দু'পাশে শাল গাছের সারি। জঙ্গল। ঝিঁঝি ডাকছে। অদ্ভুত গলায় কোনও একটা পাখিও ডাকছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে হিমেল হাওয়ার হাড় কাঁপুনি,চারদিকে দারুণ নির্জনতা। গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটাটা একশো আর আশি মাইলের মধ্যে লাফালাফি করতে-করতে গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা খায় একটা শাল গাছের গায়ে। ড্রাইভার ক্ষিপ্রহাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নেয়। বুনো শূকরের মতো গোঁ-গোঁ করতে-করতে ল্যান্ডরোভার ফের ছুটে চলে।

ড্রাইভারের কান-মাথা কালো মাফলার দিয়ে জড়ানো। গায়ে গরম কালো পুলওভারের ওপর গরম কালো কোট। ওর চ্যাপটা মুখখানায় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কপালের নীচে কুতকুতে একজোড়া চোখ।

ওরা সেবক ব্রিজ পেরিয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে শুরু হয় আঁকাবাঁকা পথ। যে পথ ফিতের মতো চলে গেছে কখনও উঁচু, কখনও নিচু। একেই তো বলে জিগজাগ কোর্স। রাস্তার একদিকে খাদ, অন্যদিকে নদী। খাদের নীচ দিয়ে তিস্তা বয়ে চলেছে। পটকা একটা জিনিস সব সময় লক্ষ করে, যখনই পাহাড়ের গায়ে হাজার-হাজার ফিট উঁচুতে কোনও রাস্তা তৈরি হয়, তখনই কোনও নদীকে চিহ্ন রাখা হয়। কখনও বাঁ দিকে, কখনও ডান দিকে পাহাড় আর নদী ঘুরে-ঘুরে চলে যায় সরল কিংবা বক্ররেখায়। পটকা কাচের জানলায় চোখ রেখে যদিও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কুয়াশার দাপটে পাহাড়, খাদ, রাস্তা মহাশূন্যে পরিণত হয়েছে। ঠাণ্ডাটা ক্রমেই জাপটে ধরছে। পটকার গায়ে উলের সোয়েটার, গরম কোট এবং সবেধন নীলমণি একটি চাদর। মা সঙ্গে বেডিং দিয়েছিলেন। কিন্তু শিয়ালদায় আসার পথে পটকা পার্ক সার্কাসে এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এসেছে। ও তো যাচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার করতে, তা সঙ্গে আবার গুড়ের কলসি কেন বাপু!

চাদরটা ব্যাগ থেকে বের করে পটকা সিটের গায়ে মাথা রাখে। ওদিকে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। দুর! ঘুম আসছে না। যদি ধস নামে? পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টির সঙ্গে ধসের একটা সম্পর্ক রয়েছে! ড্রাইভার নাকি-নাকি গলায় কোনও একটা নেপালি গানের সুর ভাঁজছে। পটকার রাষ্ট্রভাষায় দৌড় খুব বেশি নয়। নেপালি ভাষাও জানা নেই। ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে।

"ড্রাইভারজি!"

"কেয়া হ্যায় সাব?"

"ধস নামে গা?"

"কিউ?"

"বৃষ্টি হোতা হ্যায়?"

ড্রাইভার খুক-খুক করে হাসে। বলে, "পাহাড় পর যব এক তরফ সে বারিষ হোতি হ্যায়, তব ধস নামতা।"

পটকা তবু ভাবে, ওপর থেকে যদি পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়ে, তবে ড্রাইভারের সব খেলই খতম। পটকার চোখে পড়ে মাঝে-মাঝে আলোর বিন্দু! হয়তো সেখানে বস্তি আছে। অন্ধকার আর কুয়াশা মাখামাখি হয়ে ঢেকে রয়েছে। শুকনা স্টেশনই বা কখন পেরিয়ে গেল পটকা কিছুই টের পায়নি। দিনের বেলা হলে কত মনোরম দৃশ্যই না ওর চোখে পড়ত। অবশ্য কুয়াশা ঘন না থাকলে। আকাশের মেঘ কখনও নেমে আসত পটকার হাতের মধ্যে, কখনও পায়ের তলায়। মেঘের সঙ্গে লোফালুফির খেলাটা পটকার দারুণ লাগে। শীত তাড়ানোর জন্য পটকা একটা গান ধরে, 'ব্রহ্মময়ী! আমায় দে মা পাগল করে।'

ড্রাইভার বলে, "কেয়া গানা গাতা হ্যায় বাবুজি?"

পটকা গান থামিয়ে বলে, "ভগবান কা গানা।"

"আপ বোম্বাই ফিলিম কা গানা নেহি জানতা ?"

পটকা বলে, "জানতা, জানতা। আভি ভগবান কি গানা নেহি, গানে সে তো ডর ভি নেহি যাতা।"

ড্রাইভার খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। বলে "আপকো ডর লাগতা বাবুসাব ? কিউ ?"

পটকা বলে "গাড়ি গিরনে সে তো ভূত হো জায়গা।"

ড্রাইভার বলে, "নেহি। হাম্মি পাকা ডেরাইভার আছি। দেখিয়ে।" ড্রাইভার গাড়িটাকে দোলনার মতো দোলাতে থাকে। উলটো দিক থেকে আর-একটা গাড়ির জোরালো আলো পড়ে। বাঘের চোখের মতো আলোটা ছুটে আসে। পটকা আশ্বস্ত হয়। এই নির্জন রাতে আরও কেউ দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছে তা হলে ? ভাবতে-ভাবতেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায়। পটকা তো অবাক। এ সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ওভারটেক করা তো সম্ভব নয়। গাড়িটা গেল কোথায় ? পাহাড়ের মাথায় কি আরও কোনও রাস্তা আছে ? পটকা প্রশ্ন করে, "ড্রাইভারজি ! থোড়া আগাড়ি মে যো গাড়ি আয়া, ওহি গাড়ি কিধার চলা গিয়া ?"

ড্রাইভার বলে, "ভেলকি হ্যায়।"

পটকার চুলগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। ও বুকের মধ্যে অসংখ্য হাতুড়ির শব্দ শুনতে পায়। ড্রাইভার নির্বিকারভাবে স্টিয়ারিং ধরেই থাকে। চারদিকের বিশ্বচরাচর কুয়াশা আর অন্ধকারে ঢাকা। শুধু গাড়ির একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ। পটকা ভাবে, ড্রাইভারটা কি ম্যাজিসিয়ান ? ওর খুব ইচ্ছে হয় ড্রাইভারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে।

"তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় ড্রাইভারজি ?"

"মেরা নাম কুলবাহাদুর ছেত্রী।"

"তোম্ কিতনা বরষ সে এহি রাস্তামে গাড়ি চালাতি হ্যায় ?"

"হাম ? বিশ বরষ হো গিয়া।"

পটকার হঠাৎ মনে পড়ে, ওর পকেটে চিউইংগাম আছে। ও একটা কুলবাহাদুরকে দেয়। নিজেও চিবোতে থাকে। চিউইংগাম চিবোতে-চিবোতে কুলবাহাদুর বলে, "এই রাস্তার প্রতিটি বাঁক মুখস্থ। যাদের জন্ম, মৃত্যু দুইই পাহাড়ে, তাদের আবার পাহাড়কে ভয় ?"

বার কয়েক ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা হঠাৎ থেমে যায়। পটকা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। চারদিকে ঝাঁক-ঝাঁক আলো। পটকা প্রশ্ন করে, "কুলবাহাদুর ! হামলোক দার্জিলিং আ গিয়া ?"

কুলবাহাদুর বলে, "নেহি, ইয়ে কার্শিয়াং হ্যায়।"

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে যায়। গাড়ি রেখে কুলবাহাদুর তো হাওয়া। পটকা হিহি করে কাঁপতে-কাঁপতে চায়ের স্টলের দিকে এগিয়ে যায়। ও রুটির গায়ে চিজ লাগিয়ে সবে কামড় বসিয়েছে, এমন সময় গুম-গুম শব্দ। শব্দটা বাড়তে প্রচণ্ড জোরে যেন বিস্ফোরণ হয়। খানিকটা পাহাড় ধসে পড়ে।

বেঁচে যায় পটকা আর চায়ের দোকানটাও। পেছনের খানিকটা রাস্তা ধস নেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কী সর্বনাশ ! ল্যান্ডরোভারটা কোথায় ? সেটাও কি চাপা পড়েছে ? পটকা পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। ঠিক তখনই দুটি ঠাণ্ডা হাত ওর দু' কাঁধ চেপে ধরে। পটকার সারা শরীরে শীতল স্রোত বয়ে যায়। পটকা তোতলাতে থাকে, "কে এ ? কে···? কে···?" ও পেছন ফিরে দ্যাখে কুলবাহাদুর। পটকা ভয়ার্ত গলায় বলে, "আভি কেয়া হোগা ড্রাইভারজি ?" ড্রাইভার দেঁতো হাসি ছুঁড়ে বলে, "আউর দুশো দিজিয়ে।"

পটকা অসহায়ভাবে তাকায়। এই প্রথম ওর মনে হয়, ও একটা খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। কুলবাহাদুরের কাজটাই কি তবে এই ? রাতের সওয়ারিকে পাকড়াও করা ? সেইজন্যই এই হিমেল রাতে ও বাসস্ট্যান্ডে ওত পেতে থাকে। ওর পকেটে কি ভোজালি আছে ? অথবা রিভলভার ? পটকা মনে-মনে ক্যারাটের প্যাঁচ কষতে থাকে। পটকার কাছে নগদ দুশো নেই। মাত্র একশো আছে। বাকি সবই ট্রাভেলার্স চেক। কুলবাহাদুর যদি ভোজালি কিংবা রিভলভার বের করে, পটকাও তবে ক্যারাটের কায়দায় ওকে ঘায়েল করবে। যদিও পরমুহূর্তেই টেপরেকর্ডারের মতো মনের মধ্যে বেজে যায় মায়ের কথা, 'আমি যে একটা ভাল ছেলের মা হতে চেয়েছিলুম পটকা !' এই মুহূর্তে সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই। আত্মরক্ষার জন্যই তো ক্যারাটে শেখা ? অন্যায়ের সঙ্গে মোকাবিলা কখনওই নয়।

ওদিকে ফের পাহাড় ভাঙার শব্দ, গুম···গুম···গুম। পটকার পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে ওঠে। তখন কুলবাহাদুরের অবিশ্বাস্য হাতটাই পটকা পরম

বিশ্বাসে চেপে ধরতে চায়। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায়, চরম বিপর্যয়ে ও মানুষকেই বিশ্বাস করতে চায়। কিন্তু এ যেন হাত নয়। একটা কঠিন হাড়। হাতটায় কি ক্ষুর লাগানো রয়েছে? কুলবাহাদুর সেই মুহূর্তেই লোভের চোখ ঘুরিয়ে বলে, "আউর দুশো?"

ওর চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। পটকার গলা শুকিয়ে কাঠ। বলে, "আভি একশো লিজিয়ে। পরশু ট্রাভেলার্স চেক ভাঙায় কে আপকো একশো দে দুঙ্গা।"

কুলবাহাদুর বলে, "নেহি দেনে সে বিলকুল গড়বড় হো যায়গা।" সূচিভেদ্য অন্ধকার। টর্চের জোরালো আলোয় চারদিক আলোকিত হতেই পটকা দ্যাখে, ওরা সত্যিই একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পটকা কাঁপা গলায় বলে, "কুলবাহাদুর! কেয়া হোগা?"

"কুছ নেহি হোগা। আপ আইয়ে।"

আবার তেড়ে বৃষ্টি নামে। পটকার গায়ে ভাগ্যিস বর্ষাতি ছিল। কুলবাহাদুর আগে-আগে যায়। পেছনে পটকা। এই রাস্তাটাই কেবল অবিচ্ছিন্ন আছে, যদিও বিপজ্জনক।

কুলবাহাদুর গাড়িতে স্টার্ট দিতেই কোত্থেকে একটা লোক এসে হাজির। পটকার সামনের সিটে সে থপ করে বসে পড়ে। ড্রাইভারের চেনা লোক হয়তো। নেপালি ভাষায় দু'জনে কথা বলতে থাকে। লোকটার গায়ে বর্ষাতি নেই, হাতে ছাতাও নেই। অথচ সে ভেজেনি। পটকা এবং ওই লোকটার মধ্যে হাতখানেক দূরত্ব। তার সঙ্গে ওর মাঝে-মাঝেই চোখাচোখি হতে থাকে। লোকটার দৃষ্টি কুৎসিত। পটকা চোখ সরিয়ে নেয়। গাড়িটা দুরন্ত গতিতে বাঁকের পর বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে খাদে পড়তে-পড়তেও বেঁচে যায়। কুলবাহাদুর বলে, "এহি রাস্তামে একঠো অ্যাক্সিডেন্ট হুয়া হ্যায়।"

পটকার সামনের আগন্তুক খনখনে গলায় হেসে ওঠে। কুলবাহাদুরও তার সঙ্গে গলা মেলায়। পটকা বুঝতে পারে না এতে হাসির কী আছে? ড্রাইভার বলে "এহি রাস্তামে পুলিশ কো সাথমে স্মাগলার কো গোলি বদলা হোতা। কম সে কম ছ'-সাতশো ফিট নিচুমে গাড়ি গিড় গিয়া।"

সেই লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে, "এইসা মাফিক?" কথাটা বলেই ল্যান্ডরোভারের দরজাটা খুলে সে ঝাঁপ দেয় খাদে। পটকা চিৎকার করে ওঠে। ওর শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু কুলবাহাদুর নির্বিকার। পটকা ভয়ার্ত গলায় বলে, "লোকটা যে পড়ে গেল কুলবাহাদুর?"

কিন্তু সে পাত্তাই দেয় না। পরমুহূর্তেই একটা হাত পটকার কাছে এগিয়ে আসে। কোনও মুখ নেই। শরীর নেই। শুধু হাত। ফ্যাসফেসে গলায় কে যেন বলে, "একটা সিগারেট হবে দাদা?"

পটকার প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা। হাতটা ওর চোখের সামনে শুধুই ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাকে। পটকা তোতলাতে থাকে, "আপ···আপনি?" হঠাৎ দ্যাখে সিটে বসে আছে সেই লোকটা। তারপরই পটকা বেহুশ।

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার সময় ওর খুব ইচ্ছে ছিল, পাগলাঝোরা দেখবে, দেখবে বাতাসিয়া লুপ। হায় রে, কোথায় বা প্রকৃতি আর কোথায় পটকা!

ড্রাইভারের চেঁচামেচিতে ওর চৈতন্য হয়, "দার্জিলিং মে আ গিয়া।"

চকবাজার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গাড়ি থামে। পটকা চোখ কচলে দ্যাখে সেই লোকটা নেই।

"কুলবাহাদুর! ওহি আদমি কাঁহা গিয়া?"

কুলবাহাদুর খেঁকশেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসে। বলে, "ভ্যানিশ।"

পটকার মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। কুলবাহাদুর আর ওই লোকটা কি জাদুকর? না অন্য কিছু? পটকা বুকে ক্রশ-চিহ্ন আঁকে। কুলবাহাদুর বলে, "পরশু রাত দশ বাজে হাম হিঁয়া রহে গা। রুপেয়া নেহি দেনে সে জান লে লেগা।"

কুলবাহাদুর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বৃষ্টি, বরফের গুঁড়োয় পটকা জমে যেতে থাকে। ও টর্চ জ্বেলে গাইড বুকে হোটেল খোঁজে। দমকা হাওয়ায় গাইড বুকটা হঠাৎ ছিটকে চলে যায়। অন্ধকারে বার্চ গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। পটকার পাশ কাটিয়ে তখন গড়গড় করে চলে যায় কুলবাহাদুরের ল্যান্ডরোভার। গাড়িটা সোজা গিয়ে ছিটকে পড়ে খাদে। টর্চের আলোয় গাড়ির নম্বরটা পড়তে পটকার ভুল হয়নি। ও আঁতকে ওঠে। পরক্ষণেই ভাবে, এ কি কুলবাহাদুরের দ্বিতীয় খেল? পটকা উত্তেজিতভাবে একটা সিগারেট ধরায়। হাঁটতে-হাঁটতে ও এক সময় আবিষ্কার করে, ও রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে

গেছে। পটকা স্বস্তি বোধ করে। ভবঘুরে বাউণ্ডুলেদের জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলো চিরকাল জায়গা রেখে দেয়। পটকা এক কাপ গরম চায়ের লোভে এদিক-ওদিক তাকায়। এত রাতে এই ঠাণ্ডায় কোথায় চায়ের স্টল? পটকা স্টেশনমাস্টারের ঘরে উঁকি মারে। কাচের জানলা-দরজা সব বন্ধ। উনি নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে ভেতর থেকে কার যেন নাক ডাকার গর্জন আসছে। সে গর্জন কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়। পটকা জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়। ডাকে, "মাস্টারবাবু! মাস্টারবাবু!" কোনও উত্তর নেই। একেই পটকার মনের মধ্যে বিষণ্ণতার ঝড়। শিলিগুড়ি ছাড়ার পর নানা বিচ্ছিন্ন ভাবনা মনের মধ্যে তোলপাড় করে, তারপর আবার ঠাণ্ডায় বরফ হওয়ার মতো অবস্থা। স্টেশনমাস্টারকে ডেকে তুলে বলেকয়ে যদি এক কাপ চা ম্যানেজ করা যায়? ওঁর ফ্লাস্কে নিশ্চয় চা আছে। পটকা ভাবে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। এলোমেলো পা ফেলতে-ফেলতে পটকা স্টেশনের শেষ মাথায় চলে যায়। জায়গাটা একটু অন্ধকার। শরীরটাকে গরম করার জন্য পটকা আর-একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটে সবে একটা টান মেরেছে, এমন সময় ভুঁই ফুঁড়ে কে যেন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। আরে, এ যে কুলবাহাদুর! গাড়ির দুর্ঘটনাটা তবে কি সত্যিই ভেলকি? কুলবাহাদুরের চোখ হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলতে থাকে। সে দেঁতো হাসি হেসে বলে, "আঁইয়ে বাবুসাঁব, আঁইয়ে, আঁপকো চা পিয়ায়গা।"

কুলবাহাদুরের গলার স্বর নাকি-নাকি শোনাচ্ছে কেন? বেমালুম বদলে গেছে। একটা মাংসহীন কঙ্কাল ক্রমেই ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

"বাঁচাও...বাঁচাও..." পটকা চেঁচিয়ে ওঠে। ও ছুটতে-ছুটতে দ্যাখে, প্ল্যাটফর্মের আর-এক মাথায় সান্টিং-করা একটা টয় ট্রেন। পটকা লাফিয়ে ওঠে মাঝখানের বগিতে। দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিয়েই ও হাঁফাতে থাকে। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে ও দু'জন গার্ডকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়। তারপর পটকা গরম চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ে। ও শুয়ে-শুয়ে ভাবে, কুলবাহাদুরের যথার্থ রহস্যটা কী? ভূত যদি হবে, তবে টাকা নিল কেন? টাকা আরও চাইছেই বা কেন? তবে কি কোনও অতৃপ্ত আত্মা, যে টাকার জন্য খুন হয়েছিল, সেই লোকটা কি ছিল ওর শাগরেদ? এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে পটকা ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝ রাত্তিরে পটকার ঘুম ভেঙে যায়। ওর মনে হয়, চাদরটা ধরে কে যেন টানাটানি করছে। একেই পটকা ঠাণ্ডায় জমে একেবারে বরফ, তারপর আবার চাদরে টান? পটকা ভাবে, রাস্তার কুকুর-টুকুর নাকি? নাকি ধেড়ে ইঁদুর? ও চাদরটা টেনে নেয়। কিন্তু এবার মনে হয়, ওর উলটো দিকে চাদরের তলায় কেউ যেন ঢুকে পড়েছে। তবে কি কোনও ভিখিরি? বেঞ্চের তলায় এতক্ষণ ঢুকে ছিল হয়তো। পটকার হাঁটুর সঙ্গে তার হাঁটু লেগে ঠোকাঠুকিও হতে থাকে। পটকা লাথি মেরে ওটাকে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তার পা দুটো ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিমটের মতো। পটকার মায়া হয়। আহা! এই ঠাণ্ডায় ওই বা যাবে কোথায়? সেও মানুষ, আমিও মানুষ। মানুষের কি জাত আছে? বরং দুটো মানুষ জড়াজড়ি করে থাকলে ঠাণ্ডাটা একটু কমই লাগবে। কিন্তু মানুষটা যেন ওর হাঁটুতে ক্রমেই হাড় বিঁধিয়ে দিচ্ছে। কাঁকড়ার মতো সরু-সরু আঙুলগুলো দিয়ে মাঝে-মাঝে চিমটি কাটছে। পটকার দারুণ রাগ হয়। একে এই খিদে, তৃষ্ণা এবং শীতে ওর প্রায় অচৈতন্য অবস্থা, তারপর আবার এই ঝামেলা? পটকা চাদর ধরে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারে। লোকটা তড়াক করে উঠে বসে। তারপর জ্বলন্ত চোখে পটকার দিকে চেয়ে থাকে। পটকা রাগী গলায় বলে, "তোম কোন হ্যায়? তোমকো মতলব কেয়া?"

লোকটা পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দেয়, "মঁতলব তোঁ তোঁমার ভাঁই। আঁমার আঁস্তানাটা দঁখল কঁরেছ, অ্যাঁ?"

পটকার বুকের রক্ত হিম। ও কি ফের ভূতের পাল্লায় পড়েছে? পালাবার পথ নেই। দরজাটা লক করা, পটকা দ্রুত উঠে গিয়ে দরজায় লাথি মারে।

লোকটা খনখনে গলায় হেসে বলে, "দাঁদা! এঁকটা সিগারেট হঁবে? মঁনে নেঁই? ল্যান্ডরৌভারে আঁমিও যেঁ আঁপনার সঁহযাত্রী ছিলাম!"

আরে সর্বনাশ! এ কি সেই ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া লোকটা? কুলবাহাদুরের সেই শাগরেদ? পটকা দরজায় দড়াম-দড়াম লাথি কষাতে থাকে। তারপরই ছুট...ছুট...ছুট...।

ছবি : দেবাশিস দেব

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি বিড়ালের মুখ

এবারে আমরা বিড়াল আঁকা শিখব। বিড়াল, শুধু এক ভঙ্গিমায় নয়, হরেক ভঙ্গিমায় আঁকার পাতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। এবারে রইল শুধু একটি বিড়ালের মুখের আদল।

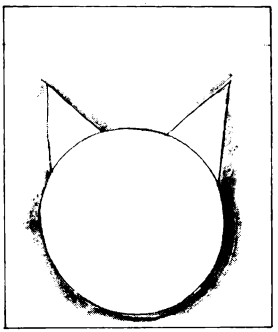

হাসিখুশি — শতদল

দিদিমণি বললেন, "বলো তো এমন কোনও জায়গা আছে, যেখানে খুব সহজে যাওয়া যায় কিন্তু বেরিয়ে আসা কঠিন?"
ছাত্রটি বলল, "খুব ঠাণ্ডায় লেপের তলা থেকে।"

রাজুকে রোজ দেরি করে ঘুম থেকে উঠতে দেখে বাবা বললেন, "মনে রেখো রাজু, যে পাখি সকালে উঠে পড়ে সে-ই কিন্তু পোকাটা ধরতে পারে।"
রাজু বলল, "তুমি এ-কথাটা কি একবারও ভেবে দেখেছ, পোকাটা সাতসকালে ওঠে বলেই পাখির পেটে যায়।"

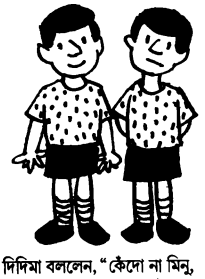

দিদিমা বললেন, "কেঁদো না মিনু, ওই দু'জন যমজ ছেলে দু'টোর মধ্যে কোনজন তোমাকে মেরেছে দেখিয়ে দাও।"
মিনু বলল, "যে ছেলেটার গালে খিমচানোর দাগ আছে, সে!"

ছবি : দেবাশিস দেব

খেলাধুলো

দাবাড়ু আনন্দের কোচ ও প্রেরণা তাঁর মা

বিশ্ব-দাবায় বিশ্বনাথন আনন্দের স্থান এখন অষ্টাদশ । তাঁকে নিয়ে লিখেছেন সব্যসাচী সরকার

এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে কমবয়সী 'পদ্মশ্রী' কে ? কনিষ্ঠতম 'অর্জুন' কে ? দাবায় ভারতের প্রথম 'গ্র্যান্ডমাস্টার' কে ? বিশ্ব-দাবায় কাকে 'লাইটিং কিড' বলা হয় ? বিশ্ব-দাবা প্রতিযোগিতায় এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি কে ? প্রশ্নগুলো কুইজ প্রতিযোগিতার মতো শোনালেও এটা এখন সকলেরই জানা যে, এর সব ক'টিরই উত্তর বিশ্বনাথন আনন্দ । সম্প্রতি জুনিয়ার উইম্বলডন জিতে ভারতবাসীকে গর্বিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন কলকাতার ছেলে লিয়ান্ডার পেজ । কিন্তু ক্রীড়াপ্রেমী ভারতবাসীর জন্য অপেক্ষা করছিল আরও একটি সুখবর । ম্যানিলা আন্তঃ অঞ্চল প্রতিযোগিতায় প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব-দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা পেলেন বিশ্বনাথন আনন্দ । তিনি দ্বিতীয় এশীয়, যিনি এই যোগ্যতা পেলেন । এর আগে এই যোগ্যতা অর্জন করেন একমাত্র ফিলিপিন্স-এর গ্র্যান্ডমাস্টার ইউজিন টোরে । সেও আট বছর আগের কথা । বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি আনন্দের বয়স কত ! না, মাত্র কুড়ি । এবারে ম্যানিলার প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুযায়ী আনন্দকে নিয়ে মোট চোদ্দজন বিশ্ব-দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা পেলেন । ৬৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হয়েছেন ইউক্রেনের একুশ বছর বয়সী ইভানচুক । ইভানচুককে আবার বিশ্ব-দাবার বিশেষজ্ঞমহল ভবিষ্যতের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান রূপে অভিহিত করেছেন । ইভানচুক যেখানে পেয়েছেন ন' পয়েন্ট, সেখানে আনন্দ পেয়েছেন সাড়ে আট ।

কে শেখালেন আনন্দকে দাবা ? কে শেখালেন মন্ত্রী, ঘোড়া, গজের চাল ? মা সুশীলা বিশ্বনাথনের কাছেই আনন্দের দাবার হাতেখড়ি । মাত্র ছ'-সাত বছর বয়সে মায়ের কোলের কাছে বসে আনন্দ ধীরে-ধীরে শিখে ফেললেন দাবার নিয়মকানুন ।

তেরো রাউন্ডের এই প্রতিযোগিতায় আনন্দ জিতেছেন ছ'টি রাউন্ড এবং ড্র করেছেন পাঁচটি। বিশ্ব-দাবায় আনন্দের স্থান এখন অষ্টাদশ। আনন্দ নিজেই বলেছেন, তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, যোগ্যতাপর্বে তিনি খেলতে পারবেন। কী করে সম্ভব হল এই অঘটন ?

দাবাড়ু হয়ে ওঠার কোনও ইচ্ছাই ছেলেবেলায় আনন্দের ছিল না। আনন্দ বলেছেন, "আমি একসঙ্গে অনেক খেলা ভালবাসতাম। দাবা ছিল সেগুলোর খেলার মধ্যে একটি। কিছুদিন পরে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম এই খেলাটাই আমি সবচেয়ে ভাল খেলতে পারি, আর তারপর থেকে দাবাই আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল।" দশ বছর বয়স থেকে টুর্নামেন্ট খেলতে শুরু করলেন আনন্দ। কিন্তু কে শেখালেন আনন্দকে দাবা ? কে শেখালেন মন্ত্রী, ঘোড়া, গজের চাল ? মা সুশীলা বিশ্বনাথনের কাছেই আনন্দের দাবার হাতেখড়ি। মাত্র ছ-সাত বছর বয়সে মায়ের কোলের কাছে বসে আনন্দ ধীরে-ধীরে শিখে ফেললেন দাবার নিয়মকানুন। ১৯৬৯ সালে আনন্দর জন্ম, আর ১৯৭৬ সালে তিনি মাদ্রাজের তাল চেস ক্লাবের একজন সদস্য হয়ে উঠলেন। ১৯৭৭ সালে মাদ্রাজে জেলাভিত্তিক সাব-জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পুরস্কৃত হন আনন্দ।

ফোটো : তপন দাশ

ওই বয়সেই তিনি নিয়মিত অনুসরণ করতেন খবরের কাগজ দাবা বিভাগটি। আনন্দের যখন দশ বছর বয়স, তখন ওঁর বাবা কে বিশ্বনাথন, যিনি দক্ষিণ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন, কর্মসূত্রে চলে আসেন ফিলিপিন্সে। আনন্দকে ভর্তি করে দেওয়া হল সেখানকার একটি স্কুলে। দাবা ফিলিপিন্সে অত্যন্ত জনপ্রিয়। স্কুলে পড়তে-পড়তেই আনন্দ জিততে লাগলেন একের পর এক টুর্নামেন্ট। তখন প্রতি বৃহস্পতিবার ফিলিপিন্স টিভিতে হত 'চেস টু ডে' নামে এক প্রশ্নোত্তরের আসর। প্রত্যেক বছর সেই প্রতিযোগিতা জিততে লাগলেন আনন্দ। শেষপর্যন্ত পর পর তিনবার আনন্দ জেতার পর ঠিক হল এর পর থেকে আনন্দকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হলেও আর ট্রোফি দেওয়া হবে না। শুনলে অবাক হতে হয়, পর পর সাতবার এমন ঘটনা ঘটেছিল।

মাদ্রাজে ফিরে এসে আনন্দ হয়ে উঠলেন দাবা জগতের এক বিস্ময়প্রতিভা। ১৯৮২তে রাজ্য জুনিয়ার প্রতিযোগিতা জেতার পর ১৯৮৪ সালে গোয়ায় জিতলেন জাতীয় জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ। লন্ডনের বিখ্যাত লয়েডস ব্যাঙ্ক মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার নর্ম পেলেন আনন্দ। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান বরিস স্প্যাসকির থেকে মাত্র আধ পয়েন্ট কম পান তিনি। ১৯৮৪-তেই তিনি জিতলেন কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিত এশীয় জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ। গ্রিসে অনুষ্ঠিত দাবা ওলিম্পিয়াডে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক স্কোর করে তিনি সংগ্রহ করে নেন দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার নর্মটি। ১৯৮৬-তে আনন্দ হন জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ান, আর ১৯৮৭ তে হন ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার। আনন্দের খেলার বিশেষত্ব হল, তিনি একেবারেই স্নায়ুর চাপে ভোগেন না। নিয়মানুযায়ী দু' ঘণ্টায় চল্লিশটি চাল দিতে হয়। অন্য প্রতিযোগীরা যখন প্রথমদিকে অতিরিক্ত সময় নেওয়ার জন্য শেষদিকে বিপদে পড়েন, আনন্দ তখন ১৫ মিনিটে চল্লিশটি চাল দিতে পারেন। ম্যানিলায় জিতে প্রথমেই আনন্দ ফোন করে খবর দেন নিজের বাবা-মাকে। তাঁর এই সাফল্য সম্পর্কে আনন্দ বলেছেন, "সপ্তম রাউন্ড থেকে টানা তিনটি ম্যাচ জেতার পরই খানিকটা আশাবাদী হয়ে উঠি। তবে সেই সুযোগ যে পাচ্ছিই সেটা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যাই বারো রাউন্ডে বিশ্বের ছ' নম্বর দাবাড়ু গুয়েস্কিকে হারানোর পর। জিততে পেরে দারুণ আনন্দ হয়েছিল।"

অর্থনীতির ছাত্র আনন্দের মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকে। দিনে আড়াই-তিন ঘণ্টার বেশি দাবা নিয়ে মাথা ঘামান না আনন্দ। মা সুশীলা বিশ্বনাথনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস না করে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে তিনি খেলতে যান না। মা তাঁর কোচ ও প্রেরণা। দাবা ছাড়া আনন্দ ভালবাসেন টেনিস আর সাঁতার। আর ভালবাসেন খুঁটিয়ে খেলার খবর পড়তে।

অসাধারণ এই কৃতিত্ব

আনন্দের সেরা কৃতিত্বের কথা জানিয়েছেন মানস চক্রবর্তী

মিলখা সিংয়ের ৪০০ মিটার দৌড়ের বিশ্বরেকর্ড কিংবা প্রকাশ পাড়ুকোনের অল ইংল্যান্ড এবং বিশ্বকাপ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান হওয়া। ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে ব্যক্তিগত খেলাগুলিতে সেরা পারফরম্যান্স বলতে এ পর্যন্ত এই দুটির একটিকেই ধরা হত। কিন্তু সেদিন ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় বিশ্বনাথন আনন্দ অতীতের সব কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছেন। কী করেছেন এদেশের একমাত্র গ্র্যান্ডমাস্টার ? আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটার গুরুত্ব হয়তো তেমন কিছু নয়। কিন্তু যাঁরা বিশ্ব-দাবার খবর রাখেন তাঁরাই বুঝবেন কী অসাধারণ নজির গড়েছেন আনন্দ। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান দাবাড়ু হওয়ার জন্য চ্যাম্পিয়ানকে চ্যালেঞ্জ জানান একজন চ্যালেঞ্জার। এই চ্যালেঞ্জার হওয়ার লক্ষ্যে দাবাড়ুদের খেলতে হয় ক্যানডিডেটস দাবায়। খেলতে হয় মানে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। আনন্দ সেই যোগ্যতা অর্জন করলেন ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ অঞ্চল দাবায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রসঙ্গত এশিয়া থেকে একমাত্র আনন্দই এই যোগ্যতা অর্জন করেছেন। টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন এশিয়ার সেরা দাবাড়ুদের সঙ্গে বিশ্বের নামী ৬৪ জন। যাঁদের মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার ছিলেন ১১ জন। বলাই বাহুল্য, ভারতের কোনও দাবাড়ু আজ পর্যন্ত এই যোগ্যতার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি।

সালভাদোর স্কিলাচি

দাম ৪৮ টাকা

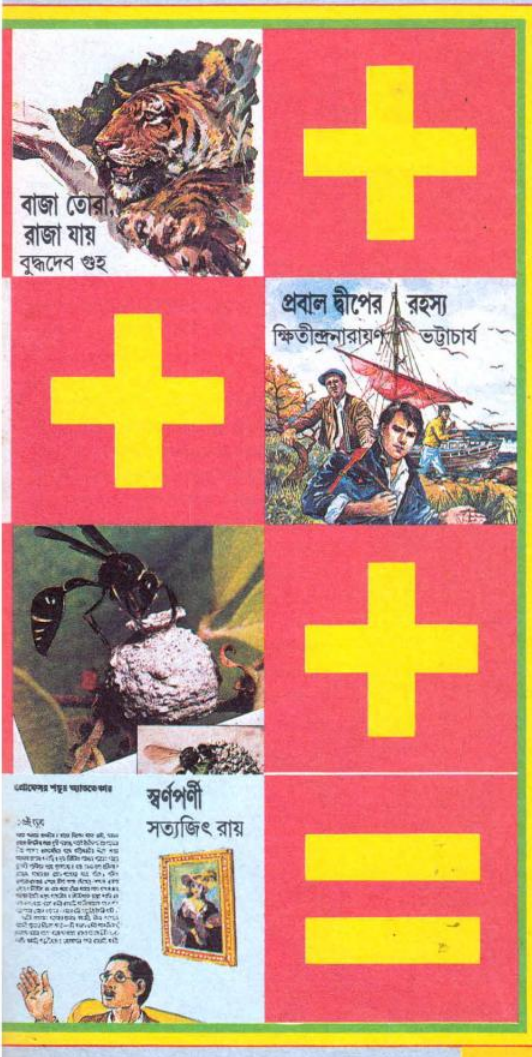

রহস্য, রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার, বিজ্ঞান, খেলা, কল্পকাহিনী··· সেরা লেখার যোগফল··· আনন্দমেলা

এই তোমার সামনে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধের গাছড়া, আছেন তরুণ প্রোফেসর শঙ্কু। ঘটনাস্থল প্রাচীন বার্লিন। পাশেই আবার নব্বইয়ের ইতালিতে জমে উঠেছে ফুটবল। ইতালির মাঠে স্বয়ং মারাদোনার পায়ের প্যাঁচ এখন তোমার সামনে। ঠক্‌ঠক্···ক্রাচের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ ? হ্যাঁ, কাকাবাবু তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট সন্তুকে নিয়ে এগিয়ে আসছেন, উদ্বিগ্নভাবে। দেখা যাচ্ছে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। রহস্যের সমাধানে তাদের দৌড় মধ্যপ্রদেশেও। রহস্য-রোমাঞ্চর সঙ্গে যোগ দাও বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী। তার সঙ্গে জুড়ে দাও বিশ্বকাপ, আসন্ন বেজিং এশিয়াড নিয়ে নানান কথা। যোগ দাও গল্প, ছড়া, জাম্বো ক্রসওয়ার্ড পাজল···আর বাড়তি আকর্ষণ, বিখ্যাত খেলোয়াড়দের রঙিন ছবি। এভাবেই মজার পর মজার যোগফল মেলাতে মেলাতে পৌঁছে যাচ্ছ জমজমাট পুজোর হাটে, আর হাতে পাচ্ছ রঙিন ঝলমলে তোমাদের মনের মতো পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা।

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

আনন্দমেলা

১৩৯৭

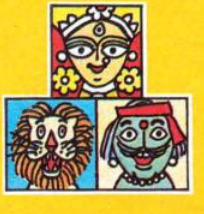

টেনিসে লিয়ান্ডারই ভারতের আশা

জুনিয়ার উইম্বলডন জিতে শোরগোল তুলেছে বাংলার ছেলে লিয়ান্ডার পেজ। তাকে নিয়ে লিখেছেন **অমিতাভ ঘোষ**

ছেলেটির জন্মের পর তার বাবা-মা ভেবেছিলেন, সে ধর্মযাজক হবে। তার 'গডফাদার'ও একজন ধর্মযাজক, নাম—ফাদার লিয়েন্ডার দ্য কস্টা। ছেলেটি ধর্মযাজক হয়নি। ছেলেটির বাবা একজন বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়। ভারতের হয়ে ওলিম্পিকে খেলেছেন। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে হকি খেলতে পারত। ছেলেটি হকিও খেলেনি। মা দারুণ বাস্কেটবল খেলতেন। ভারতের অধিনায়িকাও হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্কেটবলও সে খেলেনি। তার বদলে ছেলেবেলা থেকেই সে টেনিসকে ভালবেসে ফেলেছে। বাংলার সেরা হয়েছে, হয়েছে ভারতের সেরা, এখন

নিখুঁত লক্ষ্যে এগোচ্ছেন লিয়ান্ডার ফোটো : উৎপল সরকার

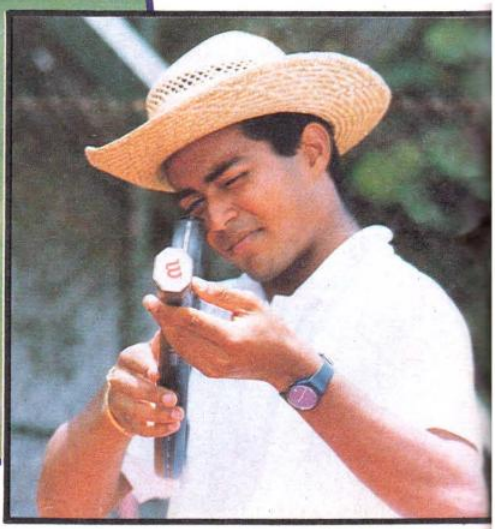

সে বিশ্বে জুনিয়ারদের মধ্যে সেরা—একেবারে এক নম্বর। সতেরো বছরের ছেলেটি কয়েকদিন আগে উইম্বলডন জিতে সবার নজর কেড়ে নিয়েছে।

ছেলেটি, অর্থাৎ লিয়েন্ডার পেজ তার বাবা মা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। বলল, "জানেন, খেলার ব্যাপারে বাবা-মা আমার ওপর কোনও কিছু চাপিয়ে দেননি। বলেছেন, 'তোমার যেটা ভাল লাগবে, সেটাই তুমি খেলবে।' আর ভালবেসে না খেললে সে-খেলায় কখনও নাম করা যায় না। অনেকেই জানেন না, প্রথমদিকে আমার পছন্দের খেলা ছিল ফুটবল। ছেলেবেলাতেই দু' হাঁটুতে চোট পাওয়ায় ফুটবল ছেড়ে দিলাম। আট বছর বয়স থেকে খেলতে শুরু করলাম টেনিস।" প্রথমদিকে বাবা ডঃ ভেস পেজের সঙ্গেই টেনিস খেলত লিয়েন্ডার। পরে আখতার আলি কিছু প্রাথমিক শিক্ষা দেন। বারো বছর বয়সে দারুণ একটা ঘটনা ঘটে গেল লিয়েন্ডারের জীবনে। ডেভিস কাপের খেলা চলছিল ভারত বনাম চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে, কলকাতার সাউথ ক্লাবে। আনন্দ অমৃতরাজ লিয়েন্ডারকে একদিন সকালে প্র্যাকটিসের জন্য ডেকে নেন। লিয়েন্ডারের খেলা তাঁকে মুগ্ধ করে। সেই সময় বিজয়, আনন্দ অমৃতরাজদের উদ্যোগে মাদ্রাজে শুরু হয়েছে 'ব্রিটানিয়া-অমৃতরাজ ট্রাস্ট', সংক্ষেপে ব্যাট। এখানে দেশের প্রতিভাবান

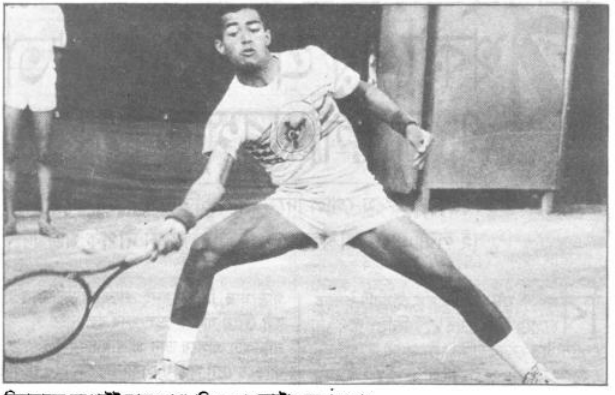

লিয়ান্ডারের সব শটেই আছে পেশাদারি দক্ষতা ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

কিশোরদের টেনিস খেলা শেখানো হয়। কয়েকদিনের মধ্যে ব্যাট থেকে আমন্ত্রণ আসে লিয়েন্ডারের কাছে।

ব্যাট-এ লিয়েন্ডারের খেলায় প্রভূত উন্নতি ঘটে। অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা, দিনে পাঁচ ঘণ্টা (শনিবার আরও বেশি) অনুশীলন, বিজয় ও আনন্দের মূল্যবান নানা পরামর্শ দারুণ সাহায্য করেছে তাকে। তবে, লিয়েন্ডার সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ কোচ ডেভিড ওমেরোর কাছে। তার স্ট্রোক নেওয়া, ব্যাক হ্যান্ড ভলির দুর্বলতা, সবকিছুতেই উন্নতি ঘটিয়েছেন সার। লিয়েন্ডারের সব কথাতেই ডেভিড 'সার'-এর কথা।

সাম্প্রতিককালে পি টি উষা ছাড়া আর কেউ কোচের প্রতি এরকম কৃতজ্ঞতা জানাননি। লিয়েন্ডার যেখানেই যায়, সঙ্গে থাকেন সার। গত বছর থেকেই প্রতিযোগিতায় নামছে লিয়েন্ডার। ইতিমধ্যে ডেভিস কাপে খেলার সুযোগ আসে। এ-বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও দারুণ খেলে লিয়েন্ডার। এক, সাত, বারো, তেরো নম্বর বাছাই খেলোয়াড়দের হারিয়েও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে হেরে যায়। কয়েক সপ্তাহ পর উইম্বলডনে একেবারে চ্যাম্পিয়ান। জয়ের পরই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সার-কে। গুরু-শিষ্য দু'জনের চোখেই তখন জল। দূরে দাঁড়িয়ে তখন এই মধুর দৃশ্যটি দেখছেন মা জেনিফার। ছেলেকে উৎসাহ দিতে তিনিও লন্ডন গিয়েছিলেন। লিয়েন্ডারের আগে দু'জন ভারতীয় জুনিয়ার উইম্বলডন জিতেছিলেন—রামনাথন ও রমেশ কৃষ্ণন। লিয়েন্ডারের খেলা দেখে মুগ্ধ টেনিস-বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, বিজয় অমৃতরাজ ও রমেশ কৃষ্ণনের পর লিয়েন্ডারই ভারতের আশা। ওর সবচেয়ে বড় সম্পদ দৃঢ় মানসিকতা, শেষ পয়েন্টের আগে কিছুতেই হারতে না চাওয়ার জেদ। অনুশীলনের মাধ্যমে যদি নিজের দোষত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে লিয়েন্ডার শুধু ছোটদের নয়, বড়দের মধ্যেও সেরা হবে। নিজের ওপর অগাধ আস্থা লিয়েন্ডারেরও। জানাল, "বিশ্বসেরা হবই আমি। পরিশ্রম, অনুশীলন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি।" বোঝা গেল লিয়েন্ডারকে রোখা সত্যিই কঠিন হবে।

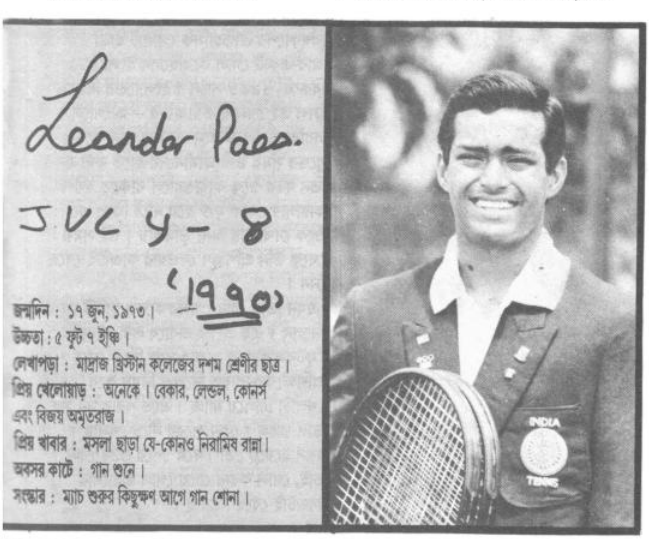

বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা এখন গোলরক্ষক

বিশ্বকাপে প্রথম গোল দিয়ে যিনি ইতিহাস রচনা করেছেন সেই লরাঁ এখন কী করছেন ? জানিয়েছেন **দীপক মজুমদার**

বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আসরটি বসতে চলেছে উরুগুয়ের মন্টি ভিডিওর পোসিটোস স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী ম্যাচটি খেলবে ফ্রান্স এবং মেক্সিকো। ১৯৩০ সালের ১৩ জুলাই। খেলা শুরুর অনেক আগেই স্টেডিয়াম ভরে গিয়েছিল।

তিনটের সময় খেলা শুরুর বাঁশি বাজার সঙ্গে-সঙ্গে দু' দলই খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রথম দশ মিনিট ওঠানামা করে খেলাটা এগোলেও, কোনও দলই তেমন আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। এভাবেই খেলা যখন এগারো মিনিট গড়িয়েছে, ঠিক তখনই ফ্রান্সের ডেলফোর বল পেয়ে যান। ডেলফোর বল নিয়ে খানিকটা এগিয়ে ডান প্রান্ত বরাবর বল বাড়িয়ে দেন সতীর্থ লিবারেতিকে। লিবারেতি বল ধরেই প্রচণ্ড গতিতে দৌড়তে থাকেন মেক্সিকোর গোলের দিকে। ওঁকে বাধা দিতে ছুটে আসেন মেক্সিকোর সাইড ব্যাক। তীব্র গতিতে তাঁকে পরাস্ত করে লিবারেতি সেন্টার করেন গোলমুখে। মাপা সেন্টার। বলটা উড়ে আসে লরাঁর কাছে। হাওয়াতেই বলটা নিয়ন্ত্রণে এনে চকিত শটে গোলরক্ষক বনফিগলিওকে পরাস্ত করেন লরাঁ। এই গোলের সুবাদেই সেদিন ফ্রান্স বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় জয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে। বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা হিসেবে লরাঁ পেয়েছেন অনন্য সম্মান।

বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম গোলদাতা লুসিয়ে লরাঁ

লরাঁ বলেছেন, "ফুটবল আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব নিলেও নিয়ম করে খেলাটা চালিয়ে যাচ্ছি।...কেন বারের নীচে খেলছি ? বয়স হয়েছে তো। দমে পেরে উঠব কেন ?

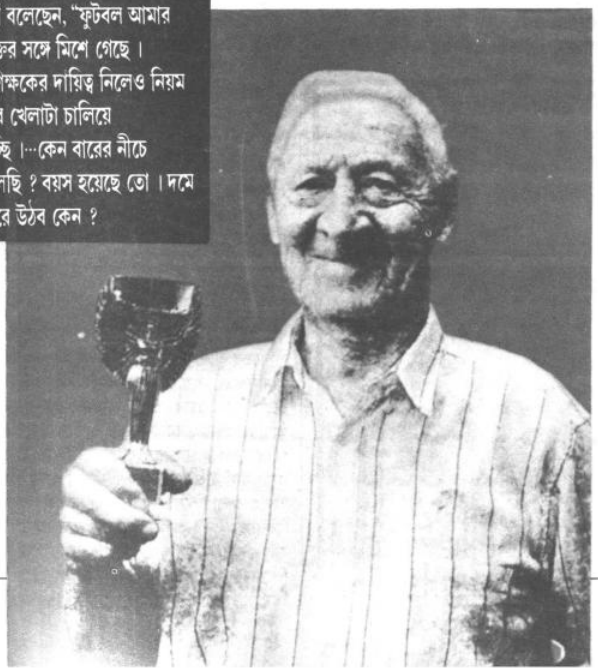

পূর্ব ফ্রান্সের জুরা পর্বতমালার কোলে বিসাঁক শহর। যে-কোনও মঙ্গলবার। এখানকার ফুটবল প্রতিযোগিতায় দুটি দল—লাল এবং হলুদ। ল্যাগরাঁজ স্টেডিয়ামে প্রবীণদের জমজমাট লড়াই। দু' দলের খেলোয়াড়দের বয়সই পঞ্চাশের ওপর। সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়ের বয়স ৮২। ইনি হলুদ দলের শেষ প্রহরী এবং দলের প্রধান উৎসাহদাতা। আক্রমণ ও পালটা আক্রমণে খেলাটি প্রায়ই জমে ওঠে। তাই দর্শকদের মধ্যে দেখা যায় প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা। স্টেডিয়াম কখনওই ফাঁকা থাকে না। উপভোগ্য এই খেলাটিতে প্রায়শই যিনি সকলের নজর কাড়েন তিনি হলুদ দলের গোলরক্ষক লুলু, অর্থাৎ লরাঁ। হ্যাঁ, ইনিই বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম গোলদাতা ফ্রান্সের লরাঁ।

লরাঁর আসল নাম লুসিয়ে লরাঁ। মূলত ইনি ছিলেন প্রান্তিক খেলোয়াড়। বাম এবং ডান দুই প্রান্তই খেলতে পারতেন। তবে ওঁর খেলার ধরন ছিল অনেকটাই 'অ্যাটাকিং' মিড ফিল্ডারের। এক মোটর কারখানার শ্রমিক লরাঁর ফুটবল-জীবন শুরু হয় ১৯২১ সালে, সি· এ· পারির যুবদলে। কাজের অবসরে খেলতেন। তবে 'গোলগেটার' ছিলেন না লরাঁ। ১৯৩০—৩৫ এই ক' বছরে এগারোটি খেলায় লরাঁ গোল করেছেন মাত্র দুটি। বিশ্বকাপের ঐতিহাসিক গোলটি ছাড়া আর-একটি গোল করেছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, ১৯৩১ সালে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্স এই খেলায় জয়ী হয় ৫—২ গোলে। লরাঁর ফুটবল-জীবনে একবার ছেদ পড়ে। যুদ্ধের সময় উনি জার্মানদের হাতে বন্দী হন। তিন বছর ওঁকে কারান্তরালে থাকতে হয়। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে মাঠে ফিরে এলেও ওঁকে দেখা যায় অন্য ভূমিকায়। ওই সময় থেকে উনি প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটিই বেছে নেন।

এখন তিনি কেন গোলরক্ষকের স্থানটি বেছে নিলেন ? এই প্রশ্নের জবাবে লরাঁ জানান, "ফুটবল আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব নিলেও নিয়ম করে খেলাটা চালিয়ে যাচ্ছি। এতে শরীর মন সব ভাল থাকে। কেন বারের নীচে খেলছি ? বয়স হয়েছে তো। দমে পেরে উঠব কেন ? তাই, গোল করার চেয়ে গোল বাঁচানোর কাজটাই বেছে নিয়েছি।"

বিশ্বের সেরা সুইপার ব্যাক বারেসি

এবারের বিশ্বকাপে ইতালির ফ্র্যাঙ্কো বারেসি প্রমাণ করলেন, তিনিই এখন বিশ্বের সেরা সুইপার ব্যাক। তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন অয়ন রায়

পশ্চিম জার্মানির কোচ বেকেনবাওয়ার-এর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই ইতালির ফ্র্যাঙ্কো বারেসির। কিন্তু দুটো ব্যাপারে খুব মিল। বিশ্বকাপে দু'জনেই সুইপার ব্যাক হিসেবে প্রবল আলোড়ন তুলেছেন। ১৯৭৪-এ সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিলেন বেকেনবাওয়ার। অতটা না হলেও বারেসিও এবার সুইপার ব্যাকেদের মধ্যে সবচেয়ে সফল। দ্বিতীয় মিল, ১৯৭৬ সালে ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলার হন বেকেনবাওয়ার। এর পরে আর কোনও ডিফেন্ডার এই সম্মান পাননি। এবার এই অসম্ভবকেই প্রায় সম্ভব করে তুলেছিলেন বারেসি। অল্প ভোটে হেরে যান মার্কো ভ্যান বাস্তেনের কাছে।

আক্রমণ প্রতিহত করাই একজন ডিফেন্ডারের কাজ। কিন্তু একজন সুইপার ব্যাককে আরও বাড়তি কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। তিনজন ডিফেন্ডারের পেছনে দাঁড়িয়ে শুধু 'লুজ বল' খেললেই হয় না, প্রতি-আক্রমণের দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়। এর জন্য দরকার ক্ষুরধার ফুটবল-বুদ্ধি। কখন আক্রমণে যেতে হবে এবং কত দ্রুত ফিরে আসতে হবে, এই যে নিখুঁত সময়জ্ঞান, এটা অন্যদের চেয়ে বারেসির অনেক ভাল। বেকেনবাওয়ারের পর ব্রাজিলের জুনিয়ার এবং আর্জেন্টিনার পাসারেল্লা সুইপার ব্যাক হিসেবে সাফল্য পেয়েছেন। তারপরই বারেসি। বারেসির খেলার স্টাইল অনেকটা জুনিয়ারের মতো। এবারের বিশ্বকাপে ভাল খেলেছেন ব্রাজিলের সুইপার ব্যাক রিকার্ডো গোমস এবং ব্রাঙ্কো, বেলজিয়ামের লিও ক্লিস্টার্স, পশ্চিম জার্মানির আগনথালার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্লাদিমির বেসোনেভও। রিকার্ডো তো এবারে চমৎকার খেললেন। বয়স কম, অভিজ্ঞতা বাড়লে আগামী বিশ্বকাপের সেরা ডিফেন্ডার অবশ্যই হবেন তিনি। ইতালির অ্যাটাকিং লেফট্ ব্যাক পাওলো মালদিনিও দারুণ খেলেছেন। কিন্তু এঁরা কেউই বারেসিকে অতিক্রম করতে পারেননি। বারেসি দ্রুত আক্রমণে উঠে একজন ফরওয়ার্ডের দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন, আবার ততটাই দ্রুততার সঙ্গে নীচে নেমে ডিফেন্সকে সামলেছেন। আক্রমণ এবং রক্ষণের যোগাযোগের চমৎকারিত্বে ইতালির বহু বিপদ রক্ষা করেছেন। ইতালি ফাইনালে উঠলে বারেসির দক্ষতার আরও ঝলকানি দেখা যেত।

তিরিশ বছরের (জন্ম ৮ মে, ১৯৬০) ফুটবলারটি কিন্তু এতদিন উপেক্ষারই শিকার হয়েছেন। ১৯৮২-র বিশ্বকাপ খেলার কথা তাঁর, সুযোগ পেলেন ১৯৯০-এ। ১৯৮২-র জাতীয় দলে থাকলেও বারেসিকে যোগ্য মনে করেননি সেই সময়ের কোচ এনজো বিয়ারজোত। তাঁর জায়গায় বিয়ারজোতের পছন্দ ছিলেন গায়তানো সিরিয়া। ১৯৮৬-র বিশ্বকাপে জায়গাই পাননি তাঁর দাদা জিউসিপে, বারেসির জন্য। দু' বছরের বড় জিউসিপেও খেলতেন একই জায়গায়। এ ধরনের আঘাত অবশ্য ফ্র্যাঙ্কোর কাছে নতুন কিছু নয়। ফুটবলার-জীবনের শুরুতেই এর থেকেও বড় আঘাত পান ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের কর্তাদের কাছ থেকে। সবে কৈশোর পেরিয়েছেন ফ্র্যাঙ্কো। ভর্তি হতে চান ইন্টারন্যাশনালে। কর্মকর্তারা তাঁর খেলা দেখে মন্তব্য করেন, "তোমার খেলার যা ধরন দেখছি, তাতে শখের ফুটবলার হওয়া যায় মাত্র, কিছুতেই বড় ফুটবলার হওয়া সম্ভব নয়।" দুঃখিত হলেও ভেঙে পড়েননি ফ্র্যাঙ্কো। পরবর্তীকালে তাবড়-তাবড় ফরওয়ার্ডকে যিনি হেলায় আটকাবেন, তাঁর এত সহজে ভেঙে পড়া কি পোষায়!

১৯৭৬-এ মিলান ক্লাবে সই করলেন ফ্র্যাঙ্কো। একটি ম্যাচেও খেলার সুযোগ পেলেন না। পরের মরসুমে একটি সুযোগে টলিয়ে দিলেন ক্লাবকর্তাদের ধারণা। যেমন আক্রমণে যান, তেমনই তরতরিয়ে উঠে আসতে লাগলেন। চিনতে লাগল সবাই, টাকার অঙ্ক বাড়তে লাগল। ১৯৮৮-তে ইউরোপিয়ান কাপে দুর্দান্ত খেলেছিলেন বারেসি। তাঁর জোরালো ট্যাকল, তীব্র গতি, সাহস, নিখুঁত অনুমান ক্ষমতা, আক্রমণের বৈচিত্র্য দেখে অনেক ফুটবল-বিশেষজ্ঞই তাঁকে বেকেনবাওয়ারের উত্তরসূরি মনে করতে লাগলেন। কেউ-কেউ আবার তুলনাও করতে লাগলেন। এই তুলনাটার ঘোরতর বিরোধী বারেসি। ১·৭৬ মিটার দীর্ঘ, রোগা, অত্যন্ত শান্ত অথচ দৃঢ় স্বভাবের বারেসির অভিমত, "কাইজার আমার আদর্শ ফুটবলার। ওঁর কাছাকাছি মানের ফুটবল আমি কখনও খেলতে পারব না। আর আদর্শের সঙ্গে কোনও তুলনা চলে?"

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক স্ট্রাইকার কে? বারেসির মতে, ব্রাজিলের কারেকা। তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক মুহূর্ত কোনটি? বারেসি জানান, ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিকে তাঁকে মিডফিল্ডে খেলানো হয়। জঘন্য খেলেছিলেন তিনি। কিসে সবচেয়ে আনন্দ পান বারেসি? তাঁর চটজলদি উত্তর, "গোল বাঁচিয়ে, খেলে সবাইকে আনন্দ দিয়ে।" তাঁর দল জেতেনি, কিন্তু বিশ্বকাপে চমৎকার খেলে সবাইকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়ে গেলেন ফ্র্যাঙ্কো বারেসি।

এশিয়াড এসে গেল

আসন্ন একাদশ এশিয়াডে ভারতের সম্ভাবনা কতদূর ? এ সম্পর্কে লিখেছেন কৃশানু ভট্টাচার্য

আর মাত্র মাসদেড়েক । তারপরই শুরু হচ্ছে বেজিং এশিয়াড । চিনের ইতিহাসে খেলাধুলোর এতবড় আন্তর্জাতিক আসর আগে আর বসেনি । বেজিং এশিয়াডের মূল উদ্দেশ্য "বন্ধুত্ব, একতা ও উন্নতি ।" ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই একাদশ এশিয়াড । বেজিং ওয়ার্কার্সস্টেডিয়ামে হবে উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান । ফুটবল ফাইনালও হবে এখানে । একুশ রকমের খেলার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সাতাশটি স্টেডিয়াম । তৈরি করা হয়েছে ১৫টি নতুন স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ইয়টিং ও প্রেস সেন্টার, গেম্‌স ভিলেজ, নতুন-নতুন রাস্তাঘাট ।

বেজিংয়ে এবার আসবেন প্রায় ছ' হাজার অ্যাথলিট, এর সঙ্গে সাংবাদিক ও কর্মকর্তাদের যোগ করলে সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে দশ হাজারে । ম্যাসকট হিসেবে বাছা হয়েছে চিনের লুপ্তপ্রায় এক জাতীয় পাণ্ডাকে । উঁচু করে একটা পদক পাণ্ডাটি ধরে রেখেছে । চ্যাংচুং ফিল্ম স্টুডিওর একজন শিল্পী, লিউ ঝমগ্রেন, এই ম্যাসকটের রূপদান করেছেন । এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতও অংশ নেবে একাদশ এশিয়াডে । কী করবে ভারত ? ক'টা পদক ঘরে তুলবে ? সবচেয়ে যেটা বড় প্রশ্ন তা হল পি টি উষা কি এবারও পারবেন ভারতের জয়পতাকা তুলে ধরতে ? একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল । সাঁতার, ওয়াটারপোলো, ডাইভিং, বাস্কেটবল, বক্সিং, ফেনসিং, সাইক্লিং, ভলিবল, জিমন্যাসটিকস, জুডো, টেবল টেনিস, ফুটবল প্রভৃতি খেলা থেকে পদকের আশা না করাই ভাল । ভারতের সর্বাধিক পদক আসতে পারে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে । এখানে আমাদের সম্ভাবনা কীরকম, দেখা যাক ।

প্রায় এক দশক ধরে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের প্রধান ভরসা ছিল কেরলের মেয়েরা । প্রথমে এম ডি বালসাম্মা, পরে পি টি উষা, সাইনি আব্রাহাম (পরে উইলসন), বন্দনা রাও, বন্দনা সানবাগ, মার্সি কুট্টান । পরের দিকে এসে অশ্বিনী নাচাপ্পা, রীত আব্রাহাম, রাও বেশ নাম করেন । এবার বেজিং এশিয়াডে অংশ নেওয়ার কোনও ইচ্ছে উষার ছিল না । দিল্লি এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটের পরই তাঁর অবসর গ্রহণের ইচ্ছা ছিল । কিন্তু সরকারি চাপে তাঁকে সে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় । বেজিং এশিয়াডে এবার সাইনি দৌড়তে পারবেন কি না ঠিক নেই । মার্সি কুট্টান শেষ অবধি বেজিং যাবেন কি না তাও অনিশ্চিত ।

মেয়েদের একশো মিটার দৌড়ে ভারতের একমাত্র আশা এখনও সেই উষা । অশ্বিনী নাচাপ্পা হয়তো ব্রোঞ্জ পেতেও পারেন । দুশো মিটারে উষা দৌড়লে একটা পদক ভারত আশা করতে পারে । চারশো মিটারে উষাকে হারাবার মতো কেউ এশিয়ায় নেই । কিন্তু আটশো মিটারে ভারতের কোনও আশা নেই । রোজা কুট্টি আটশো মিটার দৌড়তে সময় নেন ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড । কিন্তু বেজিংয়ে তাঁকে পদক পেতে হলে সময় কমাতে হবে তিন সেকেন্ডের ওপর । পনেরোশো, তিন হাজার, দশ হাজার মিটার দৌড়ে আমাদের পদক পাওয়ার আশাও কম । দূরপাল্লার দৌড়ে চিন, জাপান ও কোরিয়ার মেয়েরা আমাদের মেয়েদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন ।

একশো মিটার হার্ডলসে পদক পাওয়ার মতো কেউ নেই ভারত থেকে । চারশো মিটারে অবশ্যই কোনও একটি পদক পাবেন উষা । গত নভেম্বরে দিল্লিতে এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতায় চিনের চেন জুইং তাঁকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলেছিলেন । সম্প্রতি চিনে এশিয়ান জুনিয়ার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে চেন উষার ছ' বছরের পুরনো এশিয়ান রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন । লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিকে বাইশ বছরের উষা ছিলেন ফর্মের তুঙ্গে । তা সত্ত্বেও জীবনের সেরা ৫৫·৪২ সেকেন্ড সময় করেও কোনও পদক পাননি । এই সময়ের ধারেকাছে আর কখনও পৌঁছতে না পারলেও এতদিন তাঁকে হারাবার মতো কেউ ছিলেন না এশিয়ায় । চার বছর আগে

২২ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে একাদশ এশিয়াড ।...একুশ রকমের খেলার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সাতাশটি স্টেডিয়াম ।...বেজিংয়ে এবার আসবেন প্রায় ছ' হাজার অ্যাথলিট, এর সঙ্গে সাংবাদিক ও কর্মকর্তাদের যোগ করলে সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে দশ হাজারে ।

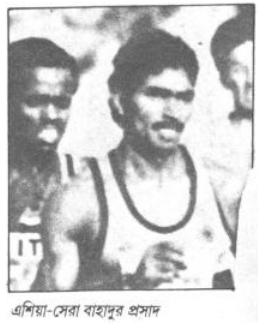

এশিয়া-সেরা বাহাদুর প্রসাদ

অশ্বিনী নাচাপ্প
নিয়ে অনেক আ

সোল এশিয়াডে সোনা পেয়েছিলেন ৫৬.০৮ সেকেন্ডে। কিন্তু এ-বছর তাঁকে সোনা পেতে হলে দৌড়তে হবে পুরনো সময়ে। কারণ কুড়ি বছর বয়সী চেন মাত্র ৫৫.১২ সেকেন্ডে চারশো মিটার হার্ডলস টপকে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছেন। বেজিংয়ে তিনি যদি মোটামুটি এই সময়ের কাছাকাছিও অন্তত দৌড় শেষ করতে পারেন তা হলে উষার পক্ষে সোনা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। হাই জাম্প, লং জাম্প, যে-কোনও থ্রোয়িং ইভেন্টে পদক পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই ভারতের মেয়েদের।

ভারতের ছেলেরা কী করবেন ? গতবার সোলে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে কোনও পদক পাননি ভারতের পুরুষ অ্যাথলিটরা। এবারও সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়। একশো, দুশো, চারশো, আটশো মিটার দৌড়ে

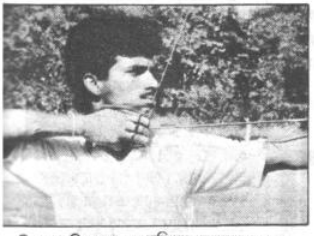

লিম্বারাম কি পারবেন বেজিংয়ে লক্ষ্যভেদ করতে

ভারতের সোনা বা রুপো পাওয়ার কোনও আশা নেই। মালয়েশিয়ান ওপেনে ভারতের অর্জন দেবাইয়া দুশো মিটারে সময় করেছিলেন ২১.৩ সেকেন্ড। ২১ সেকেন্ডের মধ্যে দুশো মিটার শেষ করতে পারলে দেবাইয়া বেজিংয়ে ব্রোঞ্জ পেলেও পেতে পারেন। চারশো মিটার আমরা এখনও দৌড়চ্ছি ৪৭ সেকেন্ডে। এশিয়ার অ্যাথলিটরা ৪৫ বা তার কমে দৌড়চ্ছেন। দেবাইয়া জাতীয় প্রতিযোগিতায় সময় নিয়েছেন ৪৭.৩ সেকেন্ড। এই সময় করেও তিনি প্রথম হয়েছেন। কাজেই চারশো বা আটশো মিটারে আমাদের সম্ভাবনা তেমন নেই, পনেরোশো মিটারে আমরা পদক পাচ্ছিই। রেলের বাহাদুর প্রসাদ এই ইভেন্টে এশিয়া-সেরা। এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে প্রথম থেকে এগিয়ে থেকে সোনা জিতেছিলেন বাহাদুর। রেলের রাম নিবাসের সম্ভাবনা আছে এই ইভেন্টে রুপো জেতার। পাঁচ হাজারে বাহাদুর যদি দৌড়ন তা হলে ভারত একটা ব্রোঞ্জ পেতেও পারে।

থ্রোয়িং ইভেন্টে শটপাটে ভারতের এস ডি

শেষবারের মতো চমক দেখাবেন কি উষা

এশান, বলবিন্দার বা বাহাদুর সিংয়ের মধ্যে যে কেউ একজন একটি পদক পেতে পারেন। জাতীয় প্রতিযোগিতায় এশান ১৮.২৮ মিটার ছুঁড়ে সোনা পেয়েছিলেন। গত এশিয়াডে ১৮.৩০ মিটার ছুঁড়ে সোনা পেয়েছিলেন মা দেং। কাজেই এশান যদি এই দূরত্বের কাছাকাছিও ছুঁড়তে পারেন তা হলে একটা পদক ভারত পেতে পারে। শক্তি সিং ৫৭.৭০ মিটার বা তার কাছাকাছি ডিসকাস ছুঁড়ছেন। বেজিংয়ে এই দূরত্ব তাঁকে ব্রোঞ্জ এনে দিতে পারে। হ্যামার বা জ্যাভলিনে আমাদের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশা জাগিয়েছেন বাংলার মেয়ে কবিতা গরারি

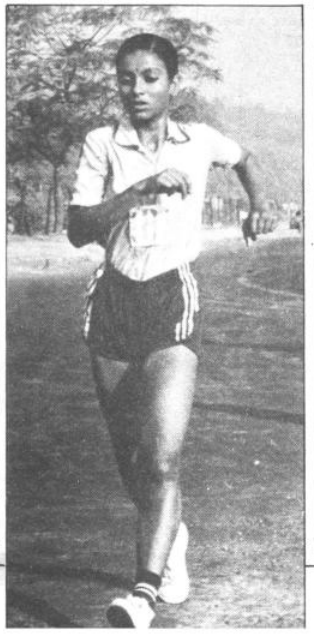

হকি, তীরন্দাজি এবং শুটিং থেকেও একাধিক পদক আশা করা যেতে পারে। তারোত্তোলন থেকেও সম্ভাবনা আছে পদক জেতার। তবে সবটাই নির্ভর করবে সেই সময়ে খেলোয়াড়রা কী ফর্মে আছেন তার ওপরে।

লিম্বারাম : অক্টোবরের সাত তারিখটিকে কখনও ভুলতে পারবেন না লিম্বারাম। ওইদিন এশিয়ান তীরন্দাজিতে ভারত এশিয়া চ্যাম্পিয়ান হয় দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে। গত এক দশক ধরে তীরন্দাজিকে কবজা করে রেখেছিলেন কোরিয়ানরা। তাঁদের সেই প্রাধান্যকে খর্ব করে ভারতের তীরন্দাজি দল—লিম্বারাম, শ্যামলাল ও কালজাং দোরজি। কিন্তু সোনা পাওয়ায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব লিম্বারামের। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে তিনি অর্জুনের একাগ্রতায় লক্ষ্যভেদ করেন। বেজিং এশিয়াডে ভারতীয় দলের পদক পাওয়ার আশা অনেকখানি নির্ভর করছে লিম্বারামের ওপর।

বাহাদুর প্রসাদ : স্টিভ ওভেটের কোচ হ্যারি উইলসন ভারতের অ্যাথলিটদের কোচিং করাতে এসে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে গেছেন রেলের বাহাদুর প্রসাদের। তাঁর কোচিংয়ে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে বাহাদুরের। কলকাতার পারমিট মিটে বাহাদুর পনেরোশো মিটারে সমান তালে দৌড়েছিলেন ওভেটের সঙ্গে। সম্প্রতি বেলফাস্ট থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছেন বাহাদুর। ওখানে এক প্রতিযোগিতায় পনেরোশো মিটার দৌড়েছেন তিন মিনিট একচল্লিশ সেকেন্ডে। বেজিং এশিয়াডে বাহাদুরই আমাদের প্রধান ভরসা।

অশ্বিনী নাচাপ্পা : বহুদিন উষার ছায়ায় ঢাকা পড়ে ছিলেন অশ্বিনী। কিন্তু গত নভেম্বরে এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে দুশো মিটারে রুপো পেয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি দুশো মিটারে হারিয়েছেন উষাকে। দেশের মধ্যে উষাকে গত ছ' বছরে কোনও ভারতীয় হারাতে পারেননি। উষাকে হারিয়ে অশ্বিনীর মনোবল এখন তুঙ্গে। বেজিংয়ে তিনি কি পারবেন পদক জিততে ?

কবিতা গরারি : হঠাৎ সংবাদপত্রের শিরোনামে এসে গিয়েছিলেন কবিতা গরারি। এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সোনা পেয়েছিলেন বারো কিমি হেঁটে। কবিতার লক্ষ্য এশিয়ান গেমস থেকেও পদক জেতা। সেই লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করছেন। বাংলার এই কিশোরী কি পারবেন বেজিংয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে ?

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

দাঁড়ানোর একটি ভঙ্গি 'কিবা দাচি'

কয়েকটি সংখ্যায় আমি কিওকুশিন ক্যারাটের দাঁড়ানোর বিভিন্ন ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি আগেই বলেছি যে, এই দাচি বা দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো ক্যারাটেতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দাঁড়ানোর ভঙ্গি—যেমন কোনও ভঙ্গিমায় সামনের পায়ের ওপর বেশি জোর নিয়ে (শরীরের ওজন) দাঁড়ানো দরকার বা কোনও ভঙ্গিমায় পেছনের পায়ে শরীরের বেশিরভাগ ওজন নিয়ে দাঁড়ানো দরকার। আবার কয়েকটি ভঙ্গিমায় দু' পায়ের ওপর শরীরের ওজন সমানভাগে ভাগ করে দাঁড়ানো দরকার। পায়ের অবস্থান বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিপক্ষের আক্রমণ বা মারের ধরন অনুযায়ী দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো ব্যবহার করা উচিত এবং সেইসঙ্গে এটাও ভালভাবে জানা উচিত যে, প্রতিপক্ষকে প্রতি-আক্রমণে কাবু করতে কীভাবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলোর ব্যবহার করতে হবে। এইবার আমি যে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা নিয়ে আলোচনা করব, তার জাপানি নাম হল 'কিবা দাচি'।

কিবা দাচি : ইংরেজিতে বলা হয় 'রাইডিং হর্স স্টান্স', বাংলায় বলা যেতে পারে—একটি মানুষ ঘোড়ার পিঠে চড়লে যেমন লাগে, সেইভাবে দাঁড়ানোর ভঙ্গি। আগেই বলেছি যে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো ইওই দাচি থেকে করা হয়। কিবা দাচিতে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে ঠিকভাবে ইওই দাচিতে দাঁড়াতে হবে। তারপর ইওই দাচিতে দাঁড়ানোর পর হাতের অবস্থান (শরীরের দু'পাশে মুঠো করে রাখা) সরিয়ে এনে নিজের মুখের সামনে মুখের উচ্চতায় হাত দুটোকে মুঠো খুলে হাতের চেটো সোজা করে ইংরেজি 'X' অক্ষরের মতো করে রাখতে হবে। হাতের চেটো মুখের দিকে থাকবে এবং বাঁ হাতের চেটোর অবস্থান হবে ডান হাতের চেটোর বাইরে। এইবার ডান পা-টাকে ডানপাশ বরাবর সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে মোটামুটিভাবে মাটি ঘেঁষে, ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ের পাতা থেকে দুই কাঁধ সমান চওড়া দূরত্বে রাখতে হবে। ডান পা ঠিকভাবে রাখা হলে হাত দুটো মুখের সামনে (X অক্ষরের অবস্থান থেকে) থেকে সরে এসে ডান হাত মুঠো করে ডান হাঁটুর কাছে এবং বাঁ হাত মুঠো করে বাঁ হাঁটুর কাছে রাখতে হবে। ডান হাঁটু থেকে ডান হাতের মুঠোর দূরত্ব এবং বাঁ হাঁটু থেকে বাঁ হাতের মুঠোর দূরত্ব সমান হবে। এই দূরত্ব মোটামুটিভাবে আট-নয় ইঞ্চি হবে। এই কিবা দাচি ভঙ্গিতে দুটো পায়ের পাতা সমান্তরালভাবে থাকবে পাশাপাশি ভাবে, দুই কাঁধ সমান দূরত্বে। একটা সরলরেখা টেনে দাঁড়ালে দুটো পায়ের আঙুল লাইন স্পর্শ করবে। দুটো হাঁটু যতটা সম্ভব বাইরের দিকে থাকবে দুটো পায়ের ওপর শরীরের ওজন সমানভাবে থাকবে। শরীরের ওপরভাগ হাঁটু থেকে মুড়ে কিছুটা নিচুতে থাকবে এবং কোমর থেকে শরীরের ওপর ভাগ মাথা পর্যন্ত শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে হবে। সেইসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে, যেন শরীরের ওপরভাগ কোমর থেকে সামনের দিকে বা পেছনের দিকে ঝুঁকে না যায়। ঠিকভাবে এই ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো সম্পূর্ণ হলে তারপর ডান পা-টাকে আবার এক কাঁধ সমান ভেতরে নিয়ে এসে শুরুর অবস্থায় ইওই দাচিতে দাঁড়াতে হবে, হাত দুটো আবার সরে মুখের কাছে এসে পুনরায় শুরুর অবস্থায় গিয়ে শেষ হবে।

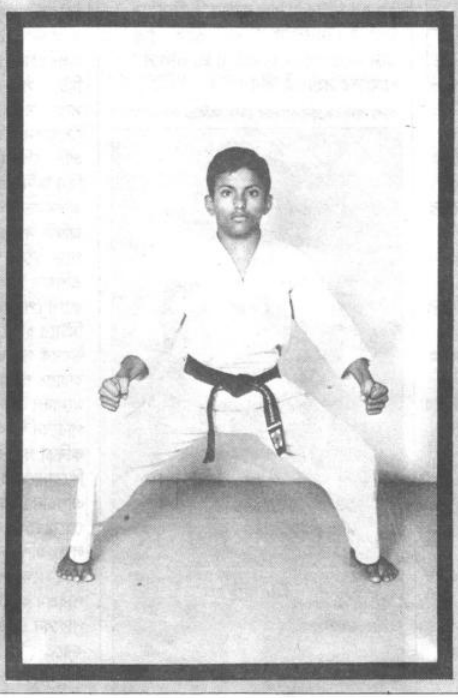

ফোটো : উৎপল সরকার

বয় কয়েকজন সেরা খেলোয়াড়ের আঘাতে পঙ্গু মেলচেস্টার রোভার্সের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করলেও ঘরের সমস্যা মেটাতে নাজেহাল হচ্ছিল। টাইনকাস্টারের সঙ্গে খেলতে যাওয়ার জন্যে রোভার্স যখন গাড়িতে ওঠার অপেক্ষায় ...

মেলচেস্টার রোভার্স ফুটবল ক্লাব

একটা গাড়ি এদিকে আসছে !

উহুঁ। ওটা তো আনকোরা নতুন গাড়ি !

কাজেই রয় হতে পারে না ! কিন্তু ও কোথায় যেতে পারে ?

রোভার্সের রয়

কিন্তু তখন ...

আঁ ? এ যে রয় ! পেছনে বসে আছে !

পেনি চালাচ্ছে ! নিশ্চয় এটা পেনির গাড়ি !

কথা দিচ্ছি ফিরতে দেরি হবে না !

না হলেই ভাল ! মনে আছে, আজ তুমি বাচ্চাদের দেখবে ? আজ রাত্তিরে আমার বাইরে যাওয়ার পালা !

সকলের মুখে পরিচিত হাসি খেলে গেল ...

মনে হচ্ছে রয়ের দুর্দশা তোমরা বুঝতে পেরেছ !

এখন বুঝতে পারছি পেনি কেন নতুন গাড়িতে বেড়াচ্ছে !

বোঝাই যাচ্ছে ওটা সম্ভির ভেট !

ইয়ে ... 'রোভার্সের রয়' কাগজের সেই বিশেষ সংখ্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই তো, রয় ?

তুমি ভালই জানো সম্পর্ক আছে, নোয়েল ...

মলাটে আমার সঙ্গে সুজান ড্যান্ডোর ছবি দেখে ও খুশি হয়নি ...

তাই ওকে খুশি করার চেষ্টা করছ

তোমরা কি বুঝতে পারছ, 'বিশ্বসুন্দরীর সঙ্গে রয়ের ফোটো ছাপা হলে পেনি একটা রঙিন টিভিও পেতে পারত !

হা হা হা !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়) □

গাবলু
বিনামূল্যে
'ফুরফুরে ময়দায়' তৈরি
সুস্বাদু কেক
বিনামূল্যে
'চিত্তচমৎকারী'
আচার
বিনামূল্যে
আমাদের বিখ্যাত
'আবার খাবো' খাস্তা
কচুরি
বিনামূল্যে
চেখে দেখুন
'মুচমুচে' সাদা বড়া
বিনা মূল্যে
'হিমশীতল'
আইস ক্রিম
বিনা মূল্যে
ভুবনবিখ্যাত
'নাছোড়বান্দা' ললিপপ
বিনা মূল্যে
শরবত
এবার এই হজমিটা খেয়ে দ্যাখো... বিলকুল মাগনা!
ঔষধালয়
7-3

গাবলু
খরিদ্দারের ঘরে সওদা পৌঁছে দেওয়া হয়
হুঁশিয়ার, কুকুর আছে
হুঁশিয়ার কুকুর আছে
হুঁশিয়ার, কুকুর আছে
7-10

(প্রথমাংশ)

ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা

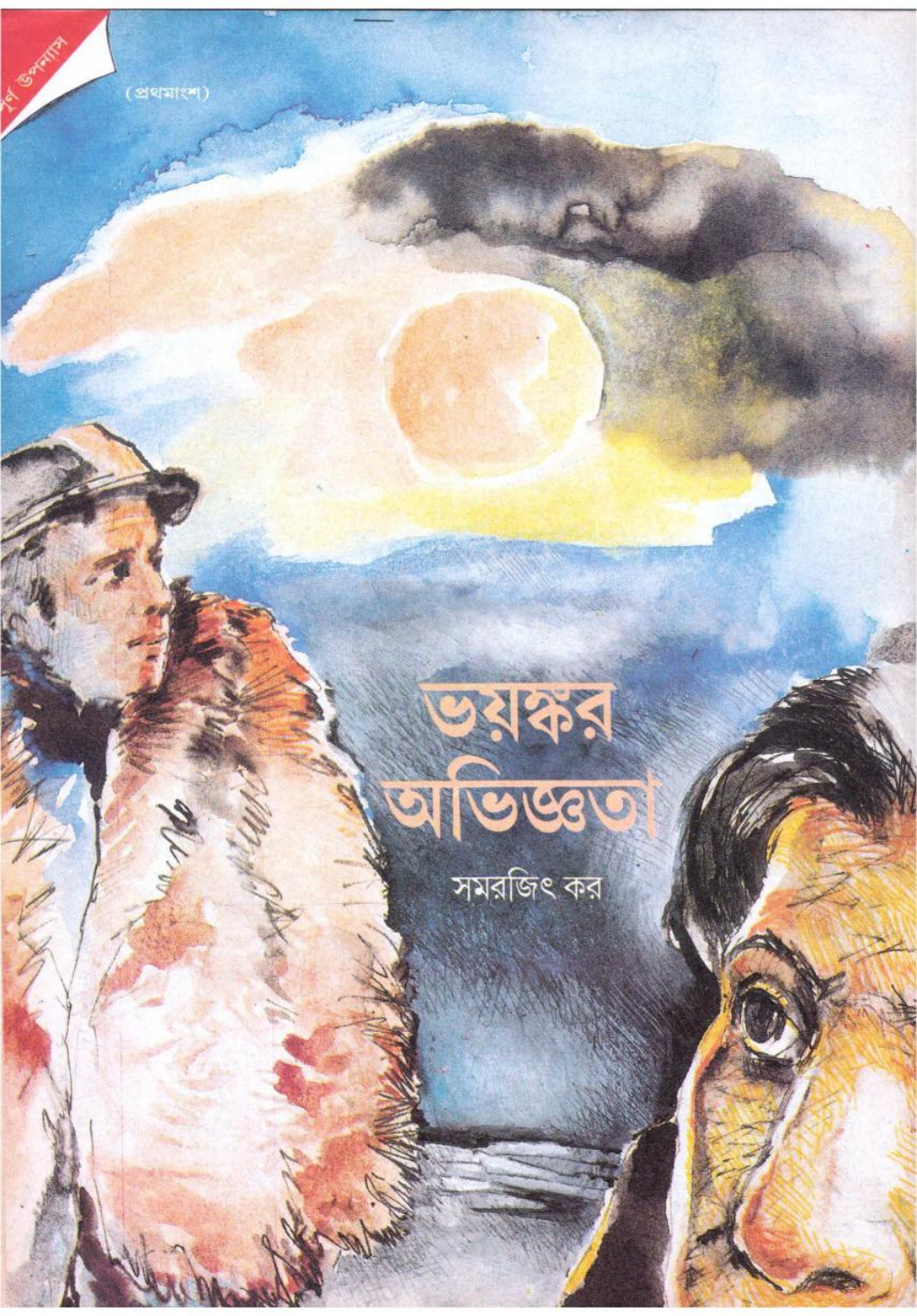

সমরজিৎ কর

তিনটি ঘটনা। বলতে পারো, যেন তিনটি বিস্ফোরণ। আর সেই বিস্ফোরণের মধ্যে আমরাও যে গিয়ে পড়ব, ভাবতেই পারিনি। এমনকী, আমরা যাঁকে 'গুরু' বলি, এবং বিজ্ঞানীমহলেও যিনি গুরু হয়ে উঠেছেন, সেই ডঃ বাসু, তিনিও কি ভাবতে পেরেছিলেন ?

বেশ তো ছিলাম। গত ছ' মাস আমাদের কেটেছে কুমেরু মহাদেশের ভিক্টোরিয়া ল্যান্ডে। সেই হিমশীতল জায়গায় একটানা এতদিন কাটানোটা যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আবহাওয়ার তাপমাত্রা কখনও নেমে যায় শূন্যেরও ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সেইসঙ্গে শুকনো বাতাসের ঝড়। মাঝে-মাঝে তার গতি গিয়ে দাঁড়ায় ঘণ্টায় দেড়শো মাইল। বরফ। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই বরফ। একবার তুষারের নীচে তো প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছিলাম। তবে সাহস এবং ধৈর্য বটে ডঃ বাসুর। পঞ্চান্নের কোঠায় এসেও এখনও যেন কুড়ি বছরের যুবক। অদ্ভুত এক কৌশলে তিনি আমাদের তুষারস্তূপ থেকে বাইরে নিয়ে আসেন। তিনিই ছিলেন আমাদের দলনেতা। প্রচণ্ড ঝড়ের সময় ওই অঞ্চলের জলজ প্রাণী কীভাবে আত্মরক্ষা করে সেটা খতিয়ে দেখাটাই ছিল আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার পর ডঃ বাসুকে বলেছিলাম, "সার আপনি যা করলেন, তাতে শুধু জলজ প্রাণীই নয়, এমন বিপদে মানুষের আচরণ কেমন হয়, সেটাও কিন্তু আমরা জেনে ফেললাম।"

"সে-কারণেই তো বলি, জীবনটাকে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দাও হে। দেখবে অনেক কিছু শিখতে পারবে। তবে হ্যাঁ, তার জন্য মাথাটা পরিষ্কার রাখা চাই, সেইসঙ্গে শিরদাঁড়াটা সোজা।" আমার কথা শুনে কত সহজভাবেই না জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

অদ্ভুত মানুষ বটে ! যে-কোনও ঝক্কি কত সহজেই না নিতে পারেন।

যেমন ঘটল আবার।

ভিক্টোরিয়া ল্যান্ড থেকে এই তো দিন-পনেরো আগে ফিরে এলাম। ডঃ বাসুও এসেছেন। আর এসেছে রাজাগোপাল। জীব-রসায়নে রাজাগোপালের মতো গবেষক আমাদের দেশে ক'জনই বা আছে। আমাদের দলের হয়ে ভিক্টোরিয়া ল্যান্ডে কাজ করতে গিয়ে একটা মজার ব্যাপার আবিষ্কার করেছে সে। দেখেছে, প্রচণ্ড ঝড়ের সময় ওই অঞ্চলের শৈবালের মধ্যে এক ধরনের প্রোটিন যৌগ তৈরি হয়। সেই যৌগ তাদের কোষ এমনভাবে কুঞ্চিত করে, যার ফলে ঝড়ের প্রবাহ কোষগুলির কোনও ক্ষতি করতে পারে না। আমাদের সবার কাছে ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনকই মনে হয়েছে। ডঃ বাসুর ধারণা তাঁর এই আবিষ্কার মানুষের মানসিক রোগ নিরাময়ে হয়তো সাহায্য করতে পারবে। ঠিকও হয়েছে, দিন পনেরো পর বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন ডঃ বাসু, হায়দরাবাদের একটি গবেষণাগারে। সে-কাজে রাজাগোপাল তো বটেই, আমরাও সাহায্য করব। আমরা বলতে আমি এবং তাঁর আরও পাঁচ সহকারী—সুমিত্রা মালহোত্রা, বিমল তিওয়ারি, ইন্দ্রজিৎ ভাল্লা, চন্দ্রশেখর এবং পঙ্কজ মেটা। পনেরো দিন অবসর কাটাতে আমরা যে-যার বাড়ি এসেছি। সুমিত্রা গেছে কানপুর, ইন্দ্রজিৎ পাতিয়ালায়, বিমল পাটনায়, চন্দ্রশেখর ত্রিচিনাপল্লী। রাজাগোপালের বাড়ি মাদুরাই হলেও তার বাবা-মা থাকেন কলকাতার ভবানীপুর এলাকায়। অতএব এখন সে কলকাতায়। ডঃ বাসুর সঙ্গে আমিও অবশ্য কলকাতায় এসেছি। তিনি গেছেন তাঁর দেশের বাড়ি, হুগলি জেলার শিয়াখালায়। আর আমি বাগবাজারে—আমাদের পুরনো বাড়িতে। ভিক্টোরিয়া ল্যান্ড থেকে ফেরার সময় আমরা ক্রাইস্ট চার্চ হয়ে প্রথমে আসি সিডনি। সেখান থেকে এয়ার ইন্ডিয়ায় ব্যাঙ্কক এবং কুয়ালালামপুর হয়ে দমদম।

দমদমে পৌঁছনোর পর ডঃ বাসু বলেছিলেন, "তা হলে দিন পনেরো বিশ্রাম করে নাও তোমরা, কেমন ? আবার হায়দরাবাদে দেখা হবে। গুড লাক।" বলেই দমদম বিমানবন্দর থেকে প্রাইভেট গাড়িতে চলে গেলেন শিয়াখালায়।

এও তাঁর এক বিচিত্র স্বভাব। কাজের সময় এসো সবাই, একসঙ্গে একাত্ম হয়ে সবাই মিলে কাজ করি। আর বিশ্রামের সময় ? কেটে পড়ো হে, সব। এবার আমি একা থাকব।

জানি, শিয়াখালায় নিজের বাড়িতে গিয়ে তিনি একাই থাকবেন। কিন্তু বিশ্রাম ? বাদ দাও তো। ওই মানুষ বিশ্রাম কাকে বলে, সত্যিই কি জানেন ? আমরা জানি, এই পনেরো দিন রাজাগোপালের আবিষ্কার সেই প্রোটিন যৌগ নিয়েই মাথা ঘামাবেন তিনি।

যাক, দিন-দশ তো গেল। এ ক'দিন তিনি কী করেছেন—রাজাগোপালের সঙ্গে সেই নিয়েই কথা হচ্ছিল আজ। তার ভবানীপুরের বাড়িতে নিছক আড্ডা দিতেই এসেছিলেন সকালের দিকে। ওর মা সেই সকালেই তোফা খাইয়ে দিলেন একপেট। যাকে

বলে সত্যিকারের সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ।

"সারের কী খবর,বলো দেখি ?" খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করেছিলাম রাজাগোপালকে।

"একেবারে নো পাত্তা, বলতে পারো।" কফির কাপে চুমুক দিয়ে জবাব দিয়েছিল সে।

"যাই বলো, আমি হলফ করে বলতে পারি, ও মানুষ এতদিন শিয়াখালার মতো গ্রামে গিয়ে বসে-বসে হাওয়া খাবেন, এ-আমি বিশ্বাসই করি না।"

"আমিও তো তাই ভাবছি। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন, দিন-পাঁচেক পর কী নাকি জরুরি কথা বলবেন। টেলিফোনে। কিন্তু কোথায়— ? গতকাল রাত্রে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। বুঝতেই পারছ, টেলিফোনের যা হাল ! ঘণ্টা-তিন চেষ্টা করেও কানেকশন পাইনি।"

"তোমারও যেমন। তুমি ভাবছ, কানেকশন পেলেই তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতেন। নিজে থেকে না চাইলে এসব ক্ষেত্রে টেলিফোন তিনি ধরেন কখনও ?"

"সে-কথা ঠিক। তবু—কুমেরুর প্রোটিন যৌগটি আমারও মাথা কুরে খাচ্ছে, ভাই। তাই সব জেনেও একবার চেষ্টা করে দেখছিলাম আর কি !"

"বাদ দাও তো। ভাল কথা, গতকাল একটি ইংরেজি দৈনিকে ছোট্ট একটি খবর বেরিয়েছে, দেখেছ ? আরে, ওই যে—সেই পাগলাটা, মানে সিনর ক্রিস্টোবাল পেরালেজ—কী এক ধরনের ছত্রাকের কথা বলেছে যেন। খবরটা ছোট। ক্রিস্টোবাল এক ধরনের ছত্রাকের সন্ধান পেয়েছে। নাকি দারুণ বিষাক্ত।"

"ক্রিস্টোবাল ? টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যে তরুণ মাইক্রোবায়োলজিস্টের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তোমার, তার কথা বলছ ? যত সব উদ্ভট ভাবনাচিন্তা যার মাথায় গিজগিজ করে, সেই মানুষটা তো ?"

"তা বোলো না, ভাই। হ্যাঁ, কখনও-কখনও সে এলোপাথাড়ি ভাবে। মনে হয় পাগলামি করছে। তবে মাঝে-মাঝে তার চিন্তাভাবনা বড় খাঁটি হয়ে দাঁড়ায়, তাও তো দেখেছ ?"

"সে-কথা মিথ্যে নয়। আমার প্রোটিন আবিষ্কারের ব্যাপারটাও তো— সত্যি কথা বলতে কি, গত বছর তার একটি গবেষণার সূত্র ধরেই কিন্তু আমার এই আবিষ্কার।"

ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদটি এতই সংক্ষিপ্ত যে, তা পড়ে আসল বক্তব্যটি আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। তাই এ-নিয়ে আর কোনও কথা হল না। আড্ডা সেরে ওর বাড়ি থেকে ফিরলাম দুপুর বারোটা নাগাদ। আর কী বলব, বাড়িতে পা দিতেই— "মেজদা, রাজুদা টেলিফোন করেছিল। এক্ষুনি আসছে—" খবর দিল বোন মিলি। "নাও, খাওয়া-দাওয়া মিটল তোমার।" সংবাদের সঙ্গে আর একটু যোগ করল সে।

"রাজাগোপালের টেলিফোন ? এই তো এলাম তার কাছ থেকে। এর মধ্যে কী হল আবার ?" মিলির কথায় কেন জানি না, কিছুটা বিভ্রান্তই হলাম আমি।

ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে সতেরো মিনিট। এর পর প্রতিটি মিনিট কাটতে লাগল— যেন এক-একটি যুগ। রাজাগোপাল এল ঠিক একটায়।

"অসম্ভব ! এ-শহরে আর বাঁচা যাবে না। কলকাতার এখন জবরজং অবস্থা।" উষ্কার বেগে ঘরে ঢুকেই কথাগুলি যেন ছুঁড়ে দিল রাজা। "লিডসে স্ট্রিটের কাছে সরকারি বাস আর ট্যাক্সিতে টক্কর, ফলে বিশাল জ্যাম। আবার পিছু হটো। ভাগ্যে মোটর বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলাম ! কোনওরকমে গা বাঁচিয়ে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে পার্ক স্ট্রিট। তারপর জগদীশ বসু রোড হয়ে শিয়ালদা। তারপর এই বাগবাজার। অনেকটা সময় গেল।"

বলেই একটি চেয়ার দখল করল সে।

"কী ব্যাপার, বলো দেখি ?" রাজার পথ-ভ্রমণের বর্ণনায় কান না দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"আরে, তার জন্যই তো ছুটে আসা। এই দ্যাখো।" বলেই পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিল সে। একটি টেলিগ্রাম।

বক্তব্যটির সবটাই সাংকেতিক ভাষায় লেখা : এস ইভ ইলেভেন জিরো জিরো এ স্টপ পেরালেজ ডি এ স্টপ বার্নস্টাইন ইনভ স্টপ। কাম ইমিডিয়েটলি অ্যাট পেস স্টপ বাসু স্টপ।

টেলিগ্রামটি পড়তেই শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে এল। মনে হল, আমার মাথার ওপর একইসঙ্গে ঘটল তিন-তিনটে বিস্ফোরণ !

"বুঝলে কিছু ?" বেশ বিচলিত হয়েই কথা বলে রাজা।

"তা একটু পেরেছি বইকী ! টেলিগ্রামটি কখন পাঠানো হয়েছে ? হ্যাঁ, এই তো। গতকাল রাত আটটায়— তার মানে, আমাদের এখানে তখন গতকাল সকাল ন'টা। আমেরিকায় এখন তো এই গ্রীষ্মে মিড ডে সেভিং টাইম চলছে। সে দেশে এখন ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে। তা হলে টেলিগ্রামটির অর্থ দাঁড়ায় এস ইভ— মানে সোলার ইভেন্ট। গতকাল সকাল এগারোটায় সূর্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে। পেরালেজ ডি এ। ডি এ মানে ডেঞ্জার। অর্থাৎ পেরালেজ বিপদে পড়েছে। বেচারা ! বিপদ ছাড়া যেন সে বাঁচতে জানে না। বার্নস্টাইন ইনভ। 'ইনভ' হল গিয়ে ইনভলভড। সর্বনাশ ! এর মধ্যে আবার ওই বুড়ো শকুনটাও এসে গেছে।" বিড়বিড় করে যেন নিজের মনেই বলে গেলাম কথাগুলি।

"কে এই বার্নস্টাইন ?" বিস্ময়ের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল রাজা। "বলতে কি, ভাই, টেলিগ্রামের সব কথাই বুঝতে পেরেছিলাম, এই বার্নস্টাইন ছাড়া।"

"সে এক মস্ত ধড়িবাজ এক সময় বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করত জীব-রসায়নে ভাল গবেষণাও করেছে। বছর পঁয়ষট্টি বয়েস এখন একটি গোয়েন্দা-সংস্থার একজন গণ্যমান্য উপদেষ্টা। এমন সন্দেহবাতিক আমি জীবনে দেখিনি। নিজেকেও বুঝি সন্দেহের বাইরে রাখে না। যাকগে। বিশ্রাম চুলোয় গেল। চলো, এক্ষুনি একবার এয়ার ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে আসি।"

আর কথা না বাড়িয়ে রওনা হলাম আমরা।

ঘড়িতে তখন দেড়টা। তড়িঘড়ি প্রথমে গেলাম পার্ক স্ট্রিট শাখার স্টেট ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে টিকিট কেনার টাকা তুলতে দুটো বেজে গেল। কিন্তু কপাল এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে গিয়ে শুনলাম, শুক্রবারের আগে তাদের কোনও ফ্লাইট নেই। শনিবার যে ফ্লাইটটি রয়েছে, তাতেও কোনও জায়গা নেই।

অতএব ছুটতে হল প্যান অ্যামেরিকান-এ।

"মে আই হেল্প ইউ, সার?" বুকিং কাউন্টারে যেতেই প্রশ্ন করলেন একজন মহিলা অফিসার।

"পেস-এর দুটি টিকিট চাই," বললাম আমি।

"কোন তারিখে যেতে চান?"

"বাই আরলিয়েস্ট ফ্লাইট। দু-তিনদিনের মধ্যে হলেই ভাল হয়।"

ভদ্রমহিলা কম্পিউটার চালু করলেন।

মিনিট-তিনেক ধরে কম্পিউটারের ভিশন প্লেটের ওপর ভেসে উঠতে লাগল এক-এক করে আগামী ছ' দিনের প্রতিটি ফ্লাইটের গ্রাসন সংরক্ষণের চিত্র।

"গস! ইমপসিবল। একটিও আসন খালি নেই।" বড়বিড় করে বলে চললেন, এবং এক সময়—"ওয়েট এ বিট, ওয়েট এ বিট—সার, গুড লাক। আজ সকালেই দেখছি দুটি টিকিট ক্যানসেল হয়েছে। আগামীকাল পি এ ১৯৯, বম্বে থেকে উড়ছে, ভোর ১টা ৫৫ মিনিটে। ওই ফ্লাইটে দুটি আসন ফাঁকা।" বলেই আমাদের দিকে চাইলেন তিনি।

অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় এতক্ষণ আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটা চলছিল। তাঁর কথায় স্বস্তি পেলাম।

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম। আসন দুটি আমাদের নামে বুক করে ফেলুন," বললাম আমি। বলেই বুকিং-এর কাগজে নাম লিখে তাঁর হাতে দিলাম।

"ডঃ সমীর রায় অ্যান্ড ডঃ এন. আর. রাজাগোপাল।"

"দ্যাটস রাইট।"

"আজ রাতে বম্বে যাচ্ছেন। পি এ ১৯৯ সকাল ১টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। নন স্টপ টু ফ্রাঙ্কফুর্ট। সেখানে সকাল ১১টায় পৌঁছচ্ছেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে পি এ ২২৫। সেখান থেকে মাইয়ামি। বিকেল চারটেয়—স্থানীয় সময়। মিয়ামিতে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ছাড়বে সন্ধে ছ'টায়। অরল্যান্ডোয় পৌঁছবেন ৭টা ৩০ মিনিটে। অরল্যান্ডোয় প্লেন রাত ১০টায়—টি ডব্লু-এ-৫৫০। পেস-এ পৌঁছবেন ১০টা ৩০ মিনিটে।" ভদ্রমহিলা পুরো ট্র্যাভেল প্ল্যানটা শুনিয়ে দিলেন।

"একসেলেন্ট! থ্যাঙ্ক ইউ।"

"ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, সার।"

এয়ারলাইনসের মাধ্যমে আমাদের পেস-এ পৌঁছনোর সংবাদ ডঃ বাসুকে পাঠিয়েই—"তা হলে, রাজা, তুমি বরং বাড়ি যাও। আমি একটি ট্যাকসি নিই, কেমন?" তারপর ঘড়ির দিকে চেয়েই, "উঃ! চারটে বেজে গেছে। বম্বের প্লেন রাত ৮টা ২৫-এ। সওয়া সাতটার মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে।" বলেই রাজাগোপালের হাতে তার টিকিটটি দিয়েই ছুটলাম সোজা বাগবাজার।

দীর্ঘ পথ-ভ্রমণের কথা থাক। শুধু এটুকু বলে রাখি—আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে। পথে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। অরল্যান্ডো থেকে প্লেন ছাড়তে মিনিট-পনেরো দেরি হয়েছিল মাত্র। পেস-এ যখন পৌঁছলাম, ঘড়িতে তখন রাত ১০টা ৪৫ মিনিট।

ফ্লোরিডার ছোট্ট শহর পেস। বিমানবন্দরটিও ছোট।

লাউঞ্জে যেতেই, "আরে! জিম যে!"

দেখি সামনেই দাঁড়িয়ে দশাসই চেহারা নিয়ে আমার পুরনো বন্ধু জেমস ওয়েলচ্। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আমার সহপাঠী ছিল। এখন তালাহাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে মলিকিউলার বায়োলজির অধ্যাপক।

"তা হলে তোমরা এলে। ডঃ বাসু খুব চিন্তিত ছিলেন।" কোনও ভূমিকা এবং উচ্ছ্বাস নেই জেমসের কথায়। তাকে খুবই আত্মমগ্ন মনে হল।

"ব্যাপার কী?" তাকে জিজ্ঞেস করতেই ঠোঁটের ওপর তর্জনী চেপে, "দেরি নয়, চটপট চলে এসো।" বলেই আমাদের নিয়ে দ্রুত লাউঞ্জ থেকে বাইরে এসে গাড়িতে বসল সে। এবং মুহূর্তে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

"বিমানবন্দরেও আমাদের ওপর নজরদারি চলছিল, স্যাম তাই তোমাকে চুপ করতে বলেছিলাম।" গাড়ি চালাতে-চালাতে কথা বলল জিম। জিম আমাকে স্যাম বলে ডাকে।

"নজরদারি! কী বলছ তুমি?" এবার আমি সত্যিই অবাক।

"ডগস! গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টস।" বেশ উষ্মার সঙ্গেই জবাব দিল জিম।

৫৩৪৬ রোলান্ড ড্রাইভ। জিমের ঠিকানা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। আর, "সার, আপনি এখানে?"

বেল টিপতেই স্বয়ং দরজা খুললেন ডঃ বাসু।

"তোমরা যে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে, আশা করিনি।" বললেন ডঃ বাসু।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর! সারা মুখে ঝড়ের ইঙ্গিত।

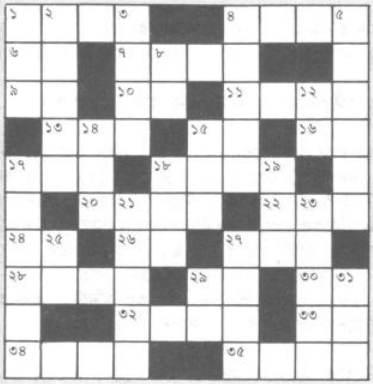

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সদর রাস্তা। (৪) বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। (৬) এর আর-এক নাম জীবন। (৭) গাছতলা। (৯) বহু। (১০) 'পার হয়ে এসেছ—'। (১১) নাচগানের আসর। (১৩) রুপো। (১৫) এ-ঘুড়ি যে পায় তার। (১৬) ধাতুবিশেষ। (১৭) ছোট্ট মরসুমি ফুল। (১৮) রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' কবিতায় যে-বন কাঁপে। (২০) ঠাট্টাতামাশা। (২২) সব উলটে আছে। (২৪) বহনযোগ্য সিঁড়ি। (২৬) মহাদেব। (২৭) দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো কৌরবকুলেও ইনিও সৎ। (২৮) আমগাছ বা আম্রপল্লব। (২৯) বায়ু। (৩০) পুত্র। (৩২) তপস্যায় ছেদ। (৩৩) শক্তি। (৩৪) কেরলদেশীয়। (৩৫) মহাসাগর।

উপর-নীচ : (১) সরকার। (২) মিঠে সুরের বাজনা। (৩) যারা খুব সপ্রতিভ তারা সচরাচর এটা খায় না। (৪) অত্যন্ত অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, সংশয় বা বিপদের ভাব। (৫) অনুলিপি লেখক। (৮) হরিণবিশেষ। (১২) কাপড়ের পটি বা ব্যান্ডেজ। (১৪) কবিতায় জন্ম। (১৫) কক্ষ। (১৭) ভাবভঙ্গি, চালচলন। (১৮) খনি। (১৯) হুড়কো, খিল। (২১) শহরের উপকণ্ঠ। (২৩) বঙ্গদেশের এক সময়ের রাজধানী। (২৫) এই স্থানে, এই সময়ে। (২৭) পাখি। (২৯) পৃথিবী উলটে গেছে। (৩১) হাজির হওয়ার হুকুম।

গত সংখ্যার সমাধান

যু	ব	রা	জ			কা	লা	পা	নি
বা	নি		ম	হা	ব	লী			র
	ব		কা	জি		চ	ক্র	ব্যূ	হ
	না	কা	ল		নী	র			ং
পা	ও	না			চ	ণ	ক		কা
হা		ত	র	শু			বি	সা	র
ড়			জ	ঙ্গ		জ	না	ব	
প	ক্ষ	পা	ত		ল	য়		ধা	
র্ব			গি	র	গি	টি		ন	দী
ত	র	বা	রি			কা	ফ	তা	ন

"ভেতরে এসো।"

তাঁর কথামতো ড্রইং-রুমে যেতেই— না। মোটেই ভুল দেখছি না। পাশাপাশি দুটি কুশন। একটিতে বসে ডঃ পেরালেজ, অপরটিতে ডঃ পিটার অ্যান্টোনিয়েভিচ।

তাঁরা ঘাড় দুলিয়ে অভ্যর্থনা জানালেও মনে হল সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন অবস্থাতেই রয়েছেন। সামনে টি-টেবিল। তার ওপর ছড়ানো একগাদা কাগজ এবং ছবি। বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ ওই কাগজপত্র নিয়েই ডঃ বাসু এবং তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন।

"চানটান সেরে ডিনার খেয়ে রাতটা ঘুমিয়ে নাও।" বললেন ডঃ বাসু, "আমরা ক্লান্ত।"

বুঝতে পারলাম, এখন তিনি আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে চান না।

॥ ২ ॥

পরদিন সকাল ছ'টার মধ্যে ঘুম ভাঙতেই দেখি, রাজা আমার আগেই উঠে পড়েছে।

"সমীর, জায়গাটা বেশ গরম, ভাই। বাতাসে আর্দ্রতাও খুব।" সে বলল, "এইমাত্র একচক্কর মর্নিং ওয়াক করে এলাম।"

"সে তো হবেই। এখান থেকে মিনিট পনেরো ড্রাইভ। তারপরই মেক্সিকো উপসাগর। জুন মাসে ফ্লোরিডার আবহাওয়া এমনই হয়।" বললাম আমি।

অঞ্চলটি নির্জন। চারপাশে প্রচুর গাছপালা। মনে হল, গা-ঢাকা দেওয়ার উপযুক্ত স্থানই বটে।

"সাতটার সময় আমরা সবাই ড্রইং-রুমে বসব।" জিম এসে জানিয়ে গেল।

তার কথামতো চানটান সেরে রাজা এবং আমি ঠিক সাতটায় ড্রইং-রুমে হাজির হলাম।

"সমীর, রাজা, এসো। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা। রাতে ভাল ঘুমিয়েছ তো?" সংক্ষেপে অভ্যর্থনা জানালেন ডঃ বাসু।

"কোনও অসুবিধে হয়নি।" বললাম আমি।

"ভাল। এবার কাজের কথায় আসা যাক। পিটার, আপনিই শুরু করুন বরং।" ডঃ বাসু বললেন।

"ডঃ রাজাগোপাল, ডঃ রায়, সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই—" অধ্যাপক পিটার অ্যান্টোনিয়েভিচ শুরু করলেন, "৩ জুন সূর্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। ডঃ বাসু ডঃ রাজাগোপালকে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, তাতে এই বিস্ফোরণের কথাই বলেছেন তিনি। জানেন তো, এখন সোলার ম্যাকসিমাম চলছে। প্রতি এগারো বছর অন্তর সূর্য একবার শান্ত হয়, আর-একবার হয় প্রচণ্ড অশান্ত। এই অশান্তির সময়টিকেই আমরা বলে থাকি সোলার ম্যাকসিমামের সময়। এ সময় সূর্যের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে ঘন-ঘন বিস্ফোরণ। দেখা দেয় বিশাল-বিশাল সৌরকলঙ্ক। সেইসঙ্গে অতিকায় সৌরচ্ছটা। যা বলছিলাম, ৩ জুন। ওইদিন চিলির মানমন্দির থেকে আমি এবং আমার কয়েকজন সহকারী দেখতে পেলাম, সূর্যের বুকে দৈত্যাকার একটি সৌরচ্ছটা। বলতে কি, গত একশো বছরে এতবড় সৌরচ্ছটা আর কখনও দেখা যায়নি। দেখতে-দেখতে সেই সৌরচ্ছটা মহাকাশে প্রায় আশি লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। আমরাও সঙ্গে-সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলাম। সৌরচ্ছটা থেকে যতরকম বিকিরণ বেরোচ্ছিল, তাদের ধরার জন্য বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রগুলি চালু করলাম আমরা। বলে রাখি, এটা দিনের দিকের ঘটনা।

"তারপর—মানে, মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা আমার।" বলে চললেন অধ্যাপক। "রাত তখন একটা বেজে কয়েক সেকেন্ড।

আমার চোখ দূরবিনের ওপর। হঠাৎ, কী বলব আপনাদের, যেন ভূত দেখছি। পরিষ্কার আকাশ। অথচ···মশাই, হাজার-তিনেক মাইল দূরে, কুয়াশার মতোই লাগল প্রথম। কয়েক সেকেন্ড যেতেই—কোথায় কুয়াশা! এ যে বড়সড় একটি মেঘ। বিরাট কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ-গতিতে। একেবারে তুলোর মতো সাদা রং। তারপর···সাদা রং উধাও। কুণ্ডলীপাকানো মেঘ থেকে বেরোতে লাগল হলুদ আলো। পুরো মেঘটিই হয়ে দাঁড়াল যেন একটি হলুদ পিণ্ড। আমি তো হতভম্ব! এ কী ভুতুড়ে কাণ্ড রে, বাবা। কিন্তু অবাক হওয়ার পালা তখনও বাকি। 'সার?' আমার পাশেই বর্ণালী-বীক্ষণের ছবি বিশ্লেষণ করছিল আমারই এক ছাত্রী এলাইজা কোহেন। 'অদ্ভুত এক ধরনের অবলোহিত রশ্মি দেখতে পাচ্ছি', সে বলল। আর তার পর মুহূর্তেই এসে হাজির আমার আর-এক সহকারী সাইমন চু। ছেলেটির বাবা চিনা, মা মেক্সিকোর মেয়ে। এখন মার্কিন নাগরিক।

"'কী ব্যাপার, ক্রিস্ট?'

"'প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, সার। গিগার কাউন্টারে ধরা পড়েছে।' সাইমন বোমা ফাটাল যেন।

"'তেজস্ক্রিয় বিকিরণ! কোত্থেকে এল?'

"'আকাশ থেকেই তো মনে হচ্ছে'

"'হায় ভগবান! তা হলে···?' কথাটা আমি আর শেষ করলাম না। 'তুমি গিয়ে গিগার কাউন্টারের ওপর লক্ষ রাখো, আমি দেখছি।' এলাইজাকেও তার বর্ণালী চিত্রগুলি আর-একবার পরীক্ষা করে দেখতে বললাম।

"তারা চলে যেতেই দূরবিন নিয়ে বসলাম আমি। ফাঁকা। সব ফাঁকা। সেই কুণ্ডলী-মেঘ অদৃশ্য হয়েছে ততক্ষণে।

"কী বলব, ডঃ বাসু। বাকি রাতটা আমি আর ঘুমোতে পারিনি। সারাক্ষণ আমার মাথায় সেই মেঘ, অবলোহিত রশ্মি আর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জটলা। প্রচণ্ড এক সন্দেহ মাথাটা কুরে খাচ্ছে। ঈশ্বর করুন, সেটা যেন মিথ্যে হয়। সেই সন্দেহের কথাটা কাউকে সাহস করে বলতে পারলাম না। দিনকাল যা পড়েছে, এসব কথা বলতেও ভয় করে। কিন্তু রহস্যটা যে কী, সেটাও তো জানা দরকার। তখন, আপনাকেই আমার মনে পড়ল, ডঃ বাসু। ডঃ পেরালেজের কাছ থেকে আপনার ঠিকানা পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আপনার কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম।"

"আপনার টেলিগ্রামটি পাওয়ার আগের দিন ডঃ পেরালেজের কাছ থেকেও একটি টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। কী এক ধরনের ছত্রাকের ব্যাপারে সে সমস্যায় পড়েছে। আমার এবং বিশেষ করে সমীর এবং রাজাগোপালের সে সাহায্য চায়। টেলিগ্রাফে অবশ্য সেই বুড়ো শকুন বার্নস্টাইনের কথা সে বলেনি। এ খবরটা শুনলাম এখানে আসার পর।"

"কী হতে পারে সেই মেঘ?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমার তো মনে হয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ। নইলে অতটা তেজস্ক্রিয়তা এবং ওইভাবে একেবারে পৃথিবীর দিক বরাবর ছড়িয়ে পড়া আর কিসে সম্ভব হতে পারে?" বলেই খানিকটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডঃ বাসুর দিকে চাইলেন অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ।

তাঁর উত্তরটি শুনে ডঃ বাসু যেন আত্মমগ্ন হলেন। বুঝতে পারলাম, চট করে তিনি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে চান না। এটা তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। এর আগেও লক্ষ করেছি, গভীর কোনও সমস্যায় পড়লে তিনি হঠাৎ মৌন হয়ে পড়েন। অতএব বুঝতে অসুবিধে হল না. এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। অর্থাৎ ব্যাপারটা তিনি

আরও খতিয়ে বুঝতে চান

তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় নিশ্চুপ বসে রইলাম আমরা।

প্রায় পাঁচ মিনিট।

প্রসঙ্গটি আবার তুললেন অধ্যাপক।

"জানি, পিটার, আপনি কী বলতে চান, আমি জানি। আপনার সিদ্ধান্তের কথা এর আগেও কয়েকবার বলেছেন। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, আমরা এখন এক অদ্ভুত পৃথিবীতে বাস করছি, পিটার, এমন এক পৃথিবী, যেখানে সব কিছুতেই অবিশ্বাস। নিজেদের ছায়া দেখেও এখন আমরা ভয় পাই। অনেক সময় সত্যটিকে আমরা হারিয়ে ফেলি। তাই বলছিলাম, এ-ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করার জানালাটা আর-একটু খুলে রাখা ভাল। এ পর্যন্ত আপনার তথ্যগুলি কোন-কোন প্রশ্নের, এখনও পর্যন্ত উত্তর কি পেয়েছি আমরা?" ডঃ বাসুর কথায় কিছুটা ক্ষোভই যেন প্রকাশ পেল।

"তা হলে সেই মেঘের ব্যাপারটা কি মিথ্যে? তার ছবিও তো দেখেছেন আপনি।" বললেন অধ্যাপক।

"কয়েকদিন সবুর করুন। সৌর-বিস্ফোরণের ব্যাপারটা যে খুবই অভিনব, সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মেঘের ব্যাপারটাই আমার মাথাটা একটু গুলিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে আমি একটু ভাবতে চাই।

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

তবে তার আগে ডঃ পেরালেজের ব্যাপারটা দেখা দরকার। বিশেষ করে তার ব্যাপারটায় ধুরন্ধর ডঃ বার্নস্টাইন যখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।"

"এ-ক্ষেত্রে এখন কী করতে বলেন?"

"একটা সূত্র যেন ধরতে পারছি। আপনি বরং আপনার ছাত্রী ইলাইজাকে খবর দিন। তার কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পাওয়া দরকার।" বলেই ডঃ পেরালেজের দিকে চাইলেন তিনি।

"ইয়েস ডক্টর!" এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতোই বসে ছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ পেরালেজ। ডঃ বাসুর প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে পেলেন তিনি।

"এতটুকু দেরি না করে আজই তোমার গবেষণাগারে যেতে চাই, ক্রিস্ট। সমীর এবং রাজা এসে গেছে যখন, তোমার কাজটাই আগে সেরে ফেলা দরকার, কেমন?" ডঃ বাসু বললেন।

"আমিও তাই ভাবছি।"

"অদ্ভুত ব্যাপার। অধ্যাপক পিটার অ্যান্টোনিয়েভিচের কথা শোনার সুযোগ দিলেন তিনি, অথচ সাইমনের সমস্যা নিয়ে কোনও কথাই হল না?"

আমার এবং রাজার মনের এই কথাটি বুঝতে পারলেন ডঃ বাসু। তাই বললেন, "একটু ধৈর্য ধরো।"

তাঁর কথায় জিমের ঠোঁটে মৃদু রহস্যের হাসি দেখা দিল।

বুঝলাম, এ-নিয়ে এখন মাথা না ঘামানোই ভাল।

॥ ৩ ॥

জিম টেলিফোনেই বিমানের আসন সংরক্ষণ করল। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স-এর বিমান। ছাড়বে বিকেল চারটেয়। পেস থেকে প্রথমে নামবে নিউঅরলিন্স। সেখান থেকে অস্টিন। আমরা মোট ছ'জন। ডঃ বাসু, অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ, ডঃ পেরালেজ, জেমস ওয়েল্‌চ, রাজাগোপাল এবং আমি।

এর পর আরও ঘণ্টা-দুয়েক ধরে চলল বৈঠক ডঃ পেরালেজের সঙ্গে। তাঁর কথা শুনে মনে হল, অজ্ঞাতসারে তিনি একটি নতুন প্রজাতির ছত্রাক তৈরি করে ফেলেছেন। কীভাবে তা সম্ভব হল, সেটাই বিচার্য।

বৈঠকের পর ডঃ বাসু বললেন, "সমীর, তুমি, রাজা এবং জিম লাঞ্চের পর ব্যাপারটা একবার খতিয়ে আলোচনা করে নাও। সেই ফাঁকে আমি এক ঘণ্টা বিশ্রাম করে নিই, কেমন?" বলেই নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন তিনি।

ওঁকে তো আমরা জানি। মুখে বললেন, বিশ্রাম। আসলে, একান্তে বসে তিনি ভাববেন। বড় কোনও সমস্যা দেখা দিলে যা তিনি করে থাকেন। তাই তাঁর কথায় আমরা মৃদু হাসলাম।

ডঃ পেরালেজের সঙ্গে কথাবার্তা হল। অদ্ভুত একটি রাসায়নিক যৌগের কথা বললেন তিনি। বুঝতে অসুবিধে হল না, সেই যৌগটিই আসল সমস্যা।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমরাও আধ ঘণ্টার মতো বিশ্রাম নিলাম। তারপর পেস-এর বিমানবন্দরে। প্লেন ছাড়ল মিনিট-পাঁচেক দেরিতে। মিনিট পঁচিশের মধ্যেই নিউঅরলিন্সের আকাশ। প্লেন সাবলীল গতিতে নামতে লাগল। নীচে মিসিসিপি নদীর সতেজ শাখা-প্রশাখা। ব-দ্বীপ। ম্যানগ্রোভ। বিমানবন্দরে মিনিট কুড়ি অপেক্ষা। অবশ্য বিমানেরই মধ্যে। তারপর আবার আকাশ। এবং মিনিট-চল্লিশের মধ্যে টেকসাসের রাজধানী অস্টিন।

বিমানবন্দরের লাউঞ্জে পৌঁছতেই বছর-পঁচিশের একটি মেয়ে প্রায় হন্তদন্ত হয়েই যেন ছুটে এল আমাদের দিকে। তার সারা মুখে উদ্বেগের চিহ্ন।

"এলাইজা!" অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ তার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

"গুড আফটারনুন, সারস।" এলাইজা আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। মনে হল হাসতে হয় তাই যেন হাসল সে।

"খবর বলো।" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

"ইট্‌স এ গামা রেডিয়েশন, সার।"

"কী বলছ, তুমি?" তার উত্তরটি শুনেই ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের সারা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

"তা হলে মনে হচ্ছে আপনার অনুমানই ঠিক, পিটার। কিন্তু কী করে তা সম্ভব?" চাপা কণ্ঠে কথা বললেন ডঃ বাসু।

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতেই সামনে এসে দাঁড়াল একটি লিমোজিন। আমরা সবাই তাতে গিয়ে উঠলাম। তারপর

উঁচু-নিচু জমির ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলল। উত্তরে শিরদাঁড়ার মতো একটি পাহাড়। লামার হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই গিয়ে পড়লাম একটি সড়কে—রিও গ্র্যান্ড। তারপর একটি চারতলা বাড়ি। বাড়িটির নাম সান্তারিতা। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাড়িটি তৈরি হয়েছে।

"আপনাদের এখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।" লিমোজিন দাঁড়াতেই ঘোষণা করল এলাইজা।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের নির্ধারিত ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম। তারপর ডিনার সারলাম আমরা কাছেই সান আন্তোনিয় পথের একটি স্প্যানিশ রেস্তরাঁয়।

ডিনার সেরে রাত আটটায় সান্তারিতার লাউঞ্জে ফিরতেই দেখি টেলিভিশনে এন বি সি নেটওয়ার্কে খবর হচ্ছে।

কিন্তু এ কী খবর শুনছি!

সংবাদ-পাঠক বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলেছেন পেরুর আরেকুইপা থেকে আমাদের সংবাদদাতা গিলবার্তে সান্তোস জানাচ্ছেন সেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের রোগ দেখা দিয়েছে। আন্দিজ পর্বতমালা অধ্যুষিত এই এলাকায় রেড ইন্ডিয়ানদের বাস। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে এখানকার পার্বত্য এলাকায় যারা বাস করে তারা খুবই দরিদ্র। সংখ্যার দিক থেকেও তারা নগণ্য....এর পরই পরদায় ফুটল জায়গাটার ছবি। ছবিতে দেখা গেল, একদল রেড ইন্ডিয়ান। তাদের সামনে গোটা-পঞ্চাশ মৃতদেহ। ....পরমুহূর্তে ফুটে উঠল গিলবার্তের মুখ। গিলবার্তে বলে চলেছেন, "অদ্ভুত রোগ। আক্রান্তদের চোখগুলি যেন ফেটে পড়ছে। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড রক্তবমি। আক্রান্ত হওয়ার ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যেই মৃত্যু। আদিবাসীদের ধারণা, এর পেছনে কাজ করছে কোনও অপদেবতার রোষ। সেই রোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের পুরোহিতরা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিচ্ছে।" একনাগাড়ে বলে চলেছেন গিলবার্তে, বলার মাঝে-মাঝে দেখানো হচ্ছে মৃতদের ছবি, উপাসনার ছবি।

খবরটি শুনতে-শুনতে ডঃ বাসুর সারা মুখ যেন পাথর হয়ে গেল।

বার্নস্টাইনের কাণ্ড নয় তো? কথাটা যেন নিজেকেই বললেন তিনি। অবশ্যই বাংলায়।

রাজাগোপাল এবং আমি পলকে তাঁর দিকে চাইলাম।

"কিন্তু লোকে বলে না, অনেক কথা হঠাৎ যেন আমাদের মনে আসে এবং তা মিলেও যায়? তাই ভাবলাম, এ-ক্ষেত্রেও তাই হবে না তো?"

"তা হলে রাত দশটা নাগাদ আমার গবেষণাগারে চলুন, ডঃ বাসু ডঃ মিত্র, ডঃ রাজাগোপাল এবং ডঃ ওয়েল্‌চ, আপনারাও আসুন। আমার সহকারীদেরও আমি আসতে বলেছি।" বললেন ডঃ পেরালেজ।

ঠিক হল অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ ওই সময় এলাইজার তথ্যটি যাচাই করে দেখবেন।

অর্থাৎ,এককথায় এবার আমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গেলাম। এক দলে রইলেন ডঃ বাসু, ডঃ পেরালেজ, জিম, রাজা এবং আমি। আর-এক দলে অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ, এলাইজা এবং কয়েকজন গবেষক।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : বিশ্বপতি মাইতি

আকাশে ওড়ার কথা □ বত্রিশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৯-২৫ : জার্মান বিমান

এই সময় যাত্রিবাহী বিমান তৈরি শুরু হল। গোড়ার দিকে এ-বিষয়ে অগ্রণী দেশগুলি হল ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জার্মানি। ১৯১৯ সালে জার্মান সংস্থা যুংকারস একটি সি-প্লেন তৈরি করলেন এফ-১৩। ছোট্ট এই জলচর বিমানটি সমাদৃত হল ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এর পর ১৯২২ সালে আর-একটি জার্মান সংস্থা ডর্নিয়ের বের করলেন তাঁদের সি-প্লেন ডি ও জে ভাল। এটিও ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহুল ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৬ সাল অবধি অনেকগুলি ভাল বিমান তৈরি হয়েছিল। আর ১৯২৫ সালে যুংকারস সংস্থা বিমান-পরিবহণে নতুন যুগের সৃষ্টি করলেন তাঁদের জি-২৪ বিমান তৈরি করে। এটিই বিশ্বের প্রথম পুরো ধাতুনির্মিত বিমান, আর এর ডানা ছিল আধুনিক নকশার। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক জার্মান বিমান অ্যালবাট্রস এল-৭৩।

ডর্নিয়ের ভাল বিমানের বিশদ বিবরণ :
নির্মাতা : ডর্নিয়ের, জার্মানি।
ডানার আয়তন : ২২·৫০ মিঃ।
লম্বায় : ১৭·২৫ মিঃ।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার।
বৈমানিক ও যাত্রী : দু'জন বৈমানিক ও ৮-১৪ জন যাত্রী।
এঞ্জিন : দুটি ৩৬০ অশ্বশক্তির রোলস রয়েস ঈগল-৯।
বিভিন্ন সময়ে বিমানটির আয়তন, যাত্রী বহন ক্ষমতা ও এঞ্জিন বদলেছে।

যুংকারস জি-২৪ বিমানের বিশদ বিবরণ :
নির্মাতা : যুংকারস, জার্মানি।
ডানার আয়তন : ২৯·৯০ মিঃ।
লম্বায় : ১৫·৬৯ মিঃ।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১৮২ কিলোমিটার।
বৈমানিক ও যাত্রী : তিনজন বৈমানিক ও ন'জন যাত্রী।

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া বিমান সংস্থার যুংকারস এফ-১৩ সি- প্লেন

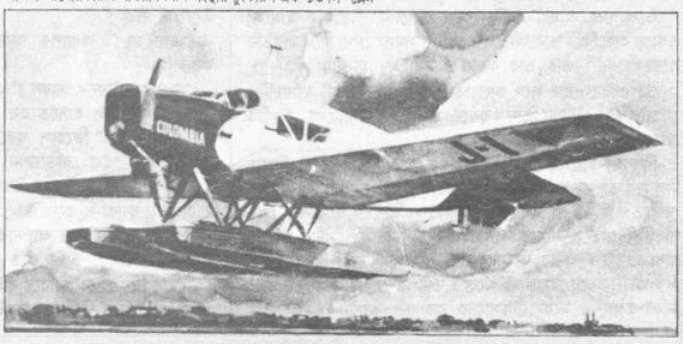

বেসিকের দ্বিতীয় ধাপ

ভাল প্রোগ্রাম লেখার জন্য বেসিকে বেশ কিছু ব্যবস্থা আছে।
জানিয়েছেন **অসীমরতন ঘোষ**

বেসিক ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার গোড়ার দিকের কিছু ধারণা ও নির্দেশ সম্পর্কে আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবার আমরা দেখে নিই, কীভাবে আরও উন্নত প্রোগ্রাম লেখা যায়। প্রথমে দেখা যাক কীভাবে কম্পিউটারকে নানারকম তথ্য পড়ানো যায়।

প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

GOTO বিবৃতি

কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখার সময় কাজগুলোকে ঠিকভাবে আমরা সাজাই। তা সত্ত্বেও কিছু লাইনের কাজ একবারের বেশি করার দরকার হয়, আবার কোনও সময় কিছু কাজের দরকারই হয় না। তখন তাদের বাদ দিতে হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কম্পিউটারের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে বদলে ফেলতে হয়। GOTO বিবৃতি নিয়ন্ত্রণ যে-কোনও দিকে বদলে দিতে পারে, ওপরে কিংবা নীচে। কোথায় যেতে হবে তার বিবৃতিক্রম লিখে দিতে হয়। কম্পিউটার GOTO বিবৃতি পেলেই সেইভাবে ঝাঁপ দেয় দূরের কোনও বিবৃতিতে।

গঠন : বিবৃতিক্রম GOTO গন্তব্যের বিবৃতিক্রম যেমন 100 GOTO 200

একটা প্রোগ্রামের উদাহরণ দেখা যাক।

```
 50 PRINT "One"
100 GOTO 200
150 PRINT "Two"
200 PRINT "Three"
250 END
```

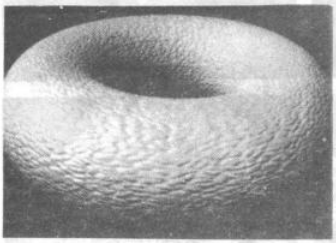

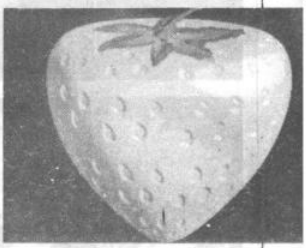

কম্পিউটারে আঁকা ত্রিমাত্রিক বৃত্তাংশ ও একটি স্ট্রবেরি। দু'ক্ষেত্রেই অনিয়ত প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে

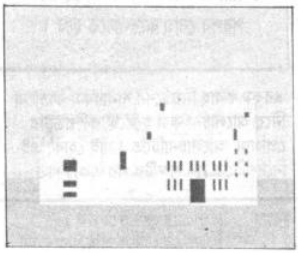

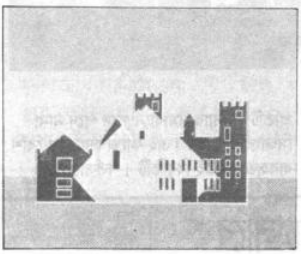

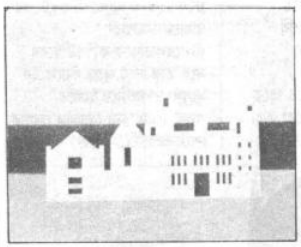

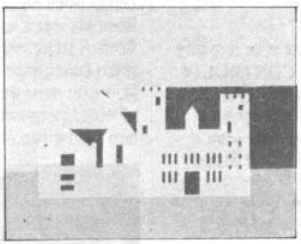

একই ছবিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে নানারকম আলোছায়ার পরিবর্তন ঘটানো যায়

এই প্রোগ্রামটি চালালে (RUN করালে) পঞ্চাশ নম্বর লাইনের জন্য ছাপা হবে One শব্দটি। পরের লাইনের জন্য নিয়ন্ত্রণ, দেড়শো নম্বর লাইনের বদলে দুশোতে চলে যাবে। ফলে ছাপা হবে Three শব্দটি। অর্থাৎ ছাপা হবে

One
Three

একশো নম্বর লাইনটি বাদ দিলে ছাপা হবে

One
Two
Three

মনে করো Welcome শব্দটা তুমি বারবার লিখতে চাও। তা হলে লেখো

```
10 PRINT "Welcome"
20 GOTO 10
30 END
```

দশ নম্বর লাইনের বিবৃতির জন্য Welcome শব্দটি পরদায় ফুটে উঠবে। পরের লাইনের নির্দেশের জন্য নিয়ন্ত্রণ আগের লাইনে ফিরে যাবে। ফলে আবার শব্দটি ছাপা হবে। এভাবে চলতেই থাকবে। থামবে না। ফলে ছাপা হবে :

Welcome
Welcome

এক্ষেত্রে রেহাই পেতে হলে CTRL এবং Break চাবিদুটো একসঙ্গে টেপা। এরকম প্রোগ্রাম কখনওই লেখা উচিত নয়।

অনেক সময় নিয়ন্ত্রণের বদল এরকম নিঃশর্তভাবে করা হয় না। তখন নিয়ন্ত্রণ বদল

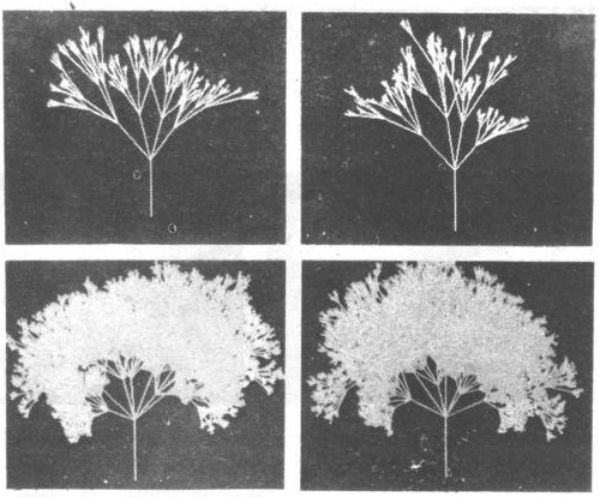

কম্পিউটারের সাহায্যে পরপর একটি গাছ তৈরি হল

ধরা যাক, আমাদের এক থেকে একশো অবধি সংখ্যা যোগ করতে হবে। লেখা যাক, একটা প্রোগ্রাম। যোগ করার মূল নীতি হল প্রথম সংখ্যার সঙ্গে পরের সংখ্যার যোগ——এই কাজ চলতে থাকবে শেষ সংখ্যা যোগ না হওয়া পর্যন্ত। অতএব বলা যায় কাজটা হল : (এক) প্রথমে যোগফল শূন্য ছিল ধরতে হবে। (২) যোগফল চলরাশির সঙ্গে অন্য সংখ্যাগুলোকে পরপর যোগ করে যেতে হবে।

হয় কোনও শর্ত সত্যি কি মিথ্যে তার ওপর ভিত্তি করে।

IF ··· THEN ··· বিবৃতি

প্রতিটি সমস্যার সমাধানে পদে পদে নানা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এই বিবৃতিটি। শর্তসাপেক্ষ

এরকম প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের নানারকম কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'কম্পিউটার প্রোগ্রাম' আলোচনাটিতে। যাই হোক, এই নির্দেশটিতে IF শব্দটির পর একটি শর্ত

কী ভাবে কম্পিউটার চালাবে

বি· বি· সি মাইক্রোকম্পিউটার অধিকাংশ স্কুলেই এই কম্পিউটারটি আছে। এইসব কম্পিউটারের সুইচ অন করার সঙ্গে-সঙ্গে পরদায় ফুটে উঠবে :

BBC Computer 16K
BASIC
>

বা এইরকম কিছু লেখা। > চিহ্নের পাশে লিখতে হবে যা তুমি লিখতে চাও। এই চিহ্নটিকে প্রম্পট বলা হয়। প্রত্যেকটি লাইন লেখা হয়ে গেলে এবং পরের লাইনে যেতে চাইলে RETURN সুইচটি টিপতে হবে। বড় অক্ষরে লিখতে গেলে CAPS LOCK টিপতে হবে। SHIFT সুইচটি টিপে রাখলে একই ফল চাবির ওপরের দিকে লেখা চিহ্নগুলো ছাপা যাবে। কম্পিউটারে যখন কোনও কিছু লেখা ফুটে উঠছে তা যদি তোমার পড়ার গতির চেয়ে বেশি হয় তা হলে CONTROL (বা CTRL) এবং SHIFT দুটো চাবিই একসঙ্গে টিপতে হয়। ডান দিকে বাঁ দিকে ওপরে ও নীচের দিকে মুখ করা তীরচিহ্ন যুক্ত চারটি চাবি কম্পিউটারে আছে। এদের সাহায্যে দপদপ করে জ্বলতে থাকা কারসরটিকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাওয়া যায়। DELETE চাবিটি টিপলে শেষে লেখা চিহ্নটি মুছে যাবে। একে ধরে থাকলে ক্রমশ আগের অক্ষরগুলো মুছে যাবে। COPY চাবিটি দিয়ে পরদায় ফুটে থাকা কিছুটা লেখা পরদার অন্য অংশে লেখা যাবে। ESCAPE চাবিটা দিয়ে সাধারণত চলতে থাকা প্রোগ্রাম বন্ধ করা যায়। BREAK চাবিটা টিপলে কম্পিউটার সব কাজ বন্ধ করে দেয়। সমস্ত কাজ সে আবার নতুন করে শুরু করে। প্রোগ্রাম লেখার পর কোনও বিশেষ চাবি মারফত বা চাবি টিপেটিপে RUN কথাটা লিখলে প্রোগ্রাম অনুযায়ী নির্দেশগুলো পরপর করতে থাকে কম্পিউটার। প্রয়োজনমতো তথ্য চেয়ে নেয়। কাজের শেষে পরদায় ফুটে ওঠে ফল।

এই প্রোগ্রামকে জমিয়ে রাখা হয় ফ্লপি ডিস্ক বা ম্যাগনেটিক টেপের মাধ্যমে। সাধারণ টেপরেকর্ডারকে কম্পিউটারের সঙ্গে তার দিয়ে জুড়ে ক্যাসেটের মধ্যেও তা জমিয়ে রাখতে পারো। এইজন্য প্রোগ্রাম লেখার শেষে প্রম্পট্ (> চিহ্ন) এর

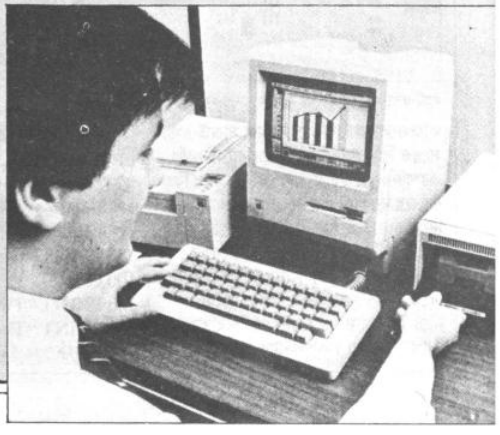

লেখা হয়। এই শর্তটি তৈরি হয় নানারকম সম্পর্ক-চিহ্ন ব্যবহার করে। শর্তের পরে THEN শব্দটি এবং তারও পরে কর্তব্যটি লেখা হয়। অর্থাৎ

গঠন : IF শর্ত THEN কর্তব্য

যেমন : 20 IF × =0 THEN GOTO 130

বা

50 IF × <0 THEN PRINT "NEGATIVE"

একটা প্রোগ্রামের উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক

```
10 INPUT "How old are you?";Age
20 IF Age>20 GOTO 50
30 PRINT "COME"
40 END
50 PRINT "DON'T COME"
60 END
```

সম্পর্কচিহ্নগুলো হল :

> (বৃহত্তর), < (ক্ষুদ্রতর), <> (অসমান), <= (ছোট বা সমান), >= (বড় বা সমান), = (সমান)।

এ ছাড়াও শর্ত তৈরি করতে AND এবং OR—এই দুই যুক্তিচিহ্নের ব্যবহার হয়। IF...THEN...ELSE...বিবৃতি

সফটওয়্যারে ফুটবল

বিশ্বের ফুটবল দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় খেলোয়াড়,বল ধরার ভঙ্গি, দৌড়নোর গতি, ড্রিবল করার দক্ষতা এরকম সমস্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়,এই সমস্ত তথ্যকে যথাযথ ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটা সফটওয়্যার। কোন খেলোয়াড়, কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে খেলেন সে সম্পর্কে সুন্দরভাবে জানিয়ে দেয় এটি। ফলে কোচদের দারুণ সুবিধে হয়েছে। তাঁরা ঠিক করে ফেলতে পারছেন তাঁর দলের আক্রমণের পদ্ধতি। বিপক্ষ দলের কোচও বসে নেই। তিনিও জেনে নিচ্ছেন অন্য দলের খেলোয়াড়দের দুর্বলতাগুলি।

ফ্লপি ডিস্কে রাখা প্রোগ্রাম ও তথ্য পাঠানো হচ্ছে কম্পিউটারে

পাশে লেখো SAVE "MELA" এর পর রিটার্ন সুইচটা টেপো। প্রোগ্রামটি মেলা নামে জমা রইল। এখন সুইচ বন্ধ করলেও প্রোগ্রাম আর মুছে যাবে না।

ডিস্কে কী কী প্রোগ্রাম জমা আছে তা জানার জন্য লেখো >* CAT <<RET>> তখন পরদায় ফুটে উঠবে প্রোগ্রামগুলোর নাম। পরে এই প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে চাইলে এই ফ্লপি ডিস্কটি ঢুকিয়ে টাইপ করো :

> LOAD "MELA"

তখন আবার তুমি ওই প্রোগ্রাম নিয়ে কাজকর্ম করতে পারবে। তোমার প্রোগ্রামটি ছাপতে চাইলে প্রিন্টারের সুইচ অন করে CTRL এবং B চাবি দুটো টাইপ করে দিলে পরদায় লেখা কাগজে ছাপা হয়ে যাবে। CTRL এবং C চাবি দুটো টিপলে ছাপার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কাজের শেষে কম্পিউটারের সুইচটি বন্ধ করতে ভুলো না যেন।

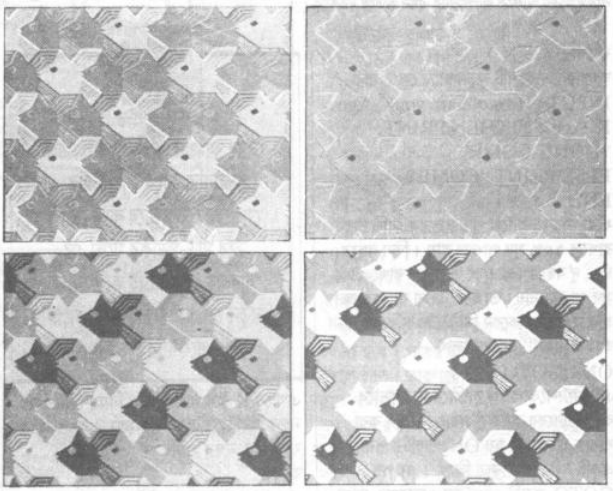

একই নকশায় রঙের তারতম্য ঘটানো যায় কম্পিউটারের সাহায্যে

অনেক সময় কম্পিউটারের স্বাভাবিক প্রবাহকে একবার বিভক্ত করলেই কাজ সারা হয় না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শাখা-প্রশাখা তৈরি করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল এটি।

গঠন : IF শর্ত THEN কর্তব্য ELSE

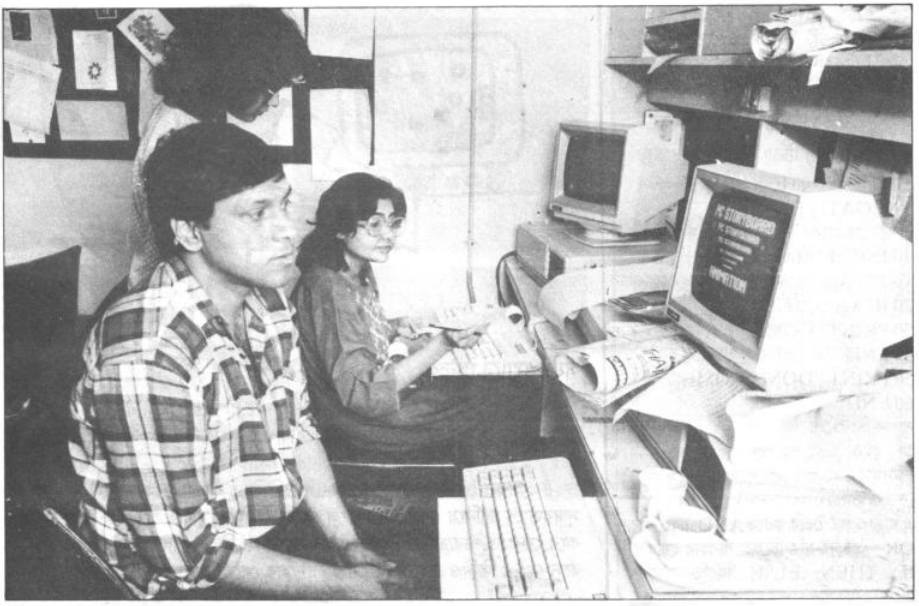

সংবাদপত্রের অফিসে কম্পিউটার এখন অত্যন্ত দরকারি

কর্তব্য

আগের উদাহরণটি নতুনভাবে লেখা যাক :

```
INPUT "How old are you?", Age
IF Age >20 THEN PRINT
"DON'T COME"
ELSE PRINT "COME"
END
```

ধরো, কোনও ব্যাঙ্কে পাঁচ বছরের বেশি টাকা রাখলে ১০% সুদ পাওয়া যায়। তিন বছরে ৮%, দু বছরে ৬% এবং তার কম রাখলে ১% সুদ পাওয়া যায়। তা হলে এসো ব্যাঙ্কে হাজার হাজার হিসেব করেন যিনি তাঁর সুবিধের জন্য আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখি :

ON...GOTO নির্দেশ

এই নির্দেশকে কাজে লাগিয়ে দারুণভাবে কম্পিউটারের কাজের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি তৈরি হয় ON শব্দটির পর একটি চলরাশি বা সূত্র লিখে। এর পর GOTO শব্দটি লেখা হয়। তারপর লেখা হয় কিছু বিবৃতিক্রম।

গঠন : ON *চলরাশি* GOTO *বিবৃতি ১, বিবৃতি ২*

যেমন : ON K GOTO 20, 40

যেসব কাজের মধ্যে একই কাজের পুনরাবৃত্তি আছে কম্পিউটার সেগুলো দারুণভাবে করে দেয়। তবে মুড়ি-মুড়কির মতো এর ব্যবহার একেবারেই ভাল নয়। নতুন প্রোগ্রাম-লিখিয়েদের পক্ষে এটা একেবারেই বর্জনীয়।

এখানে K-এর মান 1 হলে নিয়ন্ত্রণ যাবে ২০ নম্বর বিবৃতিতে, আর এই মান 2 হলে নিয়ন্ত্রণ যাবে 40 নম্বর বিবৃতিতে।

আবর্ত

যেসব কাজের মধ্যে একই কাজের পুনরাবৃত্তি আছে কম্পিউটার সেগুলো দারুণভাবে করে দেয়। একই কাজ বারবার করাতে গেলে GOTO বিবৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মুড়ি-মুড়কির মতো এর ব্যবহার একেবারেই ভাল নয়। নতুন প্রোগ্রাম লিখিয়েদের পক্ষে এটা একেবারেই বর্জনীয়। এজন্য রয়েছে এক দারুণ ব্যবস্থা।

FOR...NEXT... নির্দেশ।

কোনও কাজ নির্দিষ্ট কয়েকবার করার জন্য একে ব্যবহার করা হয়। আবর্তের শুরুতেই FOR শব্দটি লিখে তারপর একটি চলরাশি লিখতে হয়। তারপরে = এবং তারও পরে এর মান কোন সংখ্যা থেকে কোন সংখ্যা হবে তা লিখে দিতে হবে। আবর্তের শেষ লাইনে NEXT শব্দটি লিখে চলরাশিটির নাম লিখতে হবে।

গঠন : ক্রম FOR চলরাশি=সংখ্যা ১ TO সংখ্যা ২

```
... .....
... .....
... .....
ক্রম NEXT চলরাশি
```

যেমন :

```
40 FOR I=1 To 10
50 PRINT I;
60 NEXT I
70 END
```

এই প্রোগ্রামটি চালালে ফুটে উঠবে :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
এই প্রোগ্রামটির প্রথম লাইনের বিবৃতি অনুযায়ী প্রথমেই I-এর মান হল 1. 50 নম্বর বিবৃতির জন্য । সংখ্যাটি পরদায় ফুটে উঠবে । 60 নম্বর বিবৃতির জন্য কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ 70 নম্বর বিবৃতির বদলে ফিরে যাবে 40-এ । I-এর মান বেড়ে হবে দুই । এবার ছাপা হবে 2 সংখ্যাটি । নিয়ন্ত্রণ আবার ফিরবে । এভাবে দশবার আবর্তন চলতে থাকবে ।

ধরা যাক,আমাদের এক থেকে একশো অবধি সংখ্যা যোগ করতে হবে । লেখা যাক, একটা প্রোগ্রাম । যোগ করার মূল নীতি হল প্রথম সংখ্যার সঙ্গে দ্বিতীয় সংখ্যার যোগ, যোগফলের সঙ্গে পরের সংখ্যার যোগ··· এই কাজ চলতে থাকবে শেষ সংখ্যা যোগ না হওয়া পর্যন্ত । অতএব বলা যায় কাজটা হল : (১) প্রথমে যোগফল শূন্য ছিল ধরতে হবে । (২) যোগফল চলরাশির সঙ্গে অন্য সংখ্যাগুলোকে পরপর যোগ করে যেতে

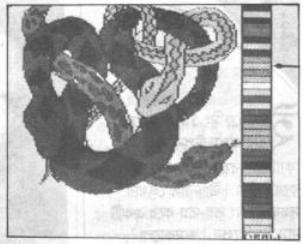

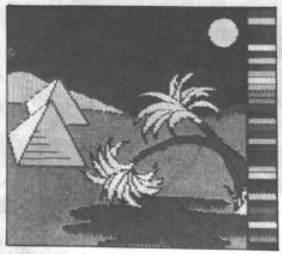

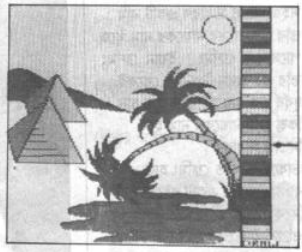

ডান দিকে দেখানো তীরের সাহায্যে রং বাছাই করে নির্দিষ্ট ডিজাইন ভরাট করা যায়

হবে ।
কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে A=A+2-এর অর্থ হল A চলরাশির আগের মানের সঙ্গে 2-এর যোগফল A চলরাশির জন্য রাখা স্মৃতিকোষে জমা পড়বে । মুছে যাবে আগের সংখ্যা ।
তা হলে আমাদের প্রোগ্রামটা হবে :

```
10 SUM =0
20 FOR I =1 To 100
30 SUM =SUM+I
40 NEXT I
50 PRINT SUM
60 END
```

প্রথম আবর্তে SUM -এর মান শূন্য থেকে বদলে হবে 1,পরের আবর্তে হবে একের বদলে তিন । তারপরে ছয় । এইভাবে যোগ হতে থাকবে ।
সবসময়ে যে FOR বিবৃতির চলরাশিটির মান এক এক করে বাড়াতে হবে তার কোনও মানে নেই । যে হারে বাড়াতে হবে তা FOR বিবৃতির শেষে STEP শব্দটি লেখার পর লিখে দিতে হয় ।
যেমন, 10 FOR × =1 TO 25 STEP 4
40 NEXT ×

(ক্রমশ)

ভাষাবিদ কম্পিউটার

পৃথিবীর সব সাহিত্যেই নামগোত্রহীন বেশ কিছু পুঁথি পাওয়া যায় । অনেক সময় কোনও লেখার লেখক কে তা ঠিক করতে দারুণ সমস্যা হয় । কম্পিউটার এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে । শব্দ ব্যবহারের বিশেষত্ব, ধ্বনিপ্রকরণ— এরকম কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে কম্পিউটার চিনে নেয় কোনও লেখককে । কোনও কবিতা সত্যিই শেক্সপিয়রের লেখা কি না বা বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে কতজন ছিলেন তা বলে দিতে পারে ভাষাবিদ কম্পিউটার ।

ছবি : দেবাশিস দেব

ইয়ান ফ্লেমিং ১৯৫২ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ক্যাসিনো রয়্যাল' লিখতে শুরু করেছিলেন। উপন্যাস লেখার সময় ফ্লেমিং তন্ন-তন্ন করে একটি নাম খুঁজছিলেন। জমকালো কোনও গম্ভীর নাম নয়, নিতান্ত সহজ, সরল সাধারণ একটি নাম। তাঁর উপন্যাসের নায়কের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না ফ্লেমিং। ইয়ান ফ্লেমিং তাঁর এই প্রথম উপন্যাস থেকেই দুর্ধর্ষ এক নায়ক সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু সেই নায়কের নাম হবে নিতান্ত সাধারণ।
ভাবতে-ভাবতে ফ্লেমিং হাত বাড়িয়েছিলেন একটা বইয়ের দিকে। তাঁর অন্যতম প্রিয় বই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাখিদের নিয়ে লেখা। বইয়ের নাম 'বার্ডস অব ওয়েস্ট ইন্ডিজ'। লেখকের নাম খুব সাধারণ, আচমকা সেই নামটি যেন ধাক্কা মারল ফ্লেমিংয়ের বুকে। লেখকের নাম জেম্‌স বন্ড। আর পেছনে ফিরে তাকাননি ফ্লেমিং। জামাইকা দ্বীপের গোল্ডেনেয়ি শহরে নিজের বাড়িতে বসে দ্রুত লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। ফ্লেমিং পরে রসিকতা করে বলেছিলেন, "আমার উপন্যাস লেখার পেছনে সেরকম কোনও মহৎ কারণ নেই। তেতাল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলাম, বুড়ো বয়সে বিয়ে করার সেই আঘাতটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যই বোধ হয় উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম।" বন্ডের অভিযান যেন শুরু হয়েছিল ফ্লেমিংয়ের অবিবাহিত জীবনকে বিদায় জানিয়ে।

নায়ক জেম্‌স বন্ড বিদায়-অভিনন্দন জানিয়েছিল ফ্লেমিংয়ের জীবনের এক অধ্যায়কে, কিন্তু ফ্লেমিংকে নয়। স্রষ্টা ইয়ান ফ্লেমিং এবং সৃষ্টি জেম্‌স বন্ড, এই দু'জনের মধ্যে মিল অনেক।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্লেমিং নৌ-বাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের প্রধান পরিচালকের সহকারী

'বণ্ড' চরিত্রের অভিনেতা স্যান কোনারি। ইনসেট : ইয়ান ফ্লেমিং।

আসল জেম্‌স বন্ড

দুস্কো পোপোভ জন্মসূত্রে যুগোস্লাভিয়ার লোক। ব্রিটিশ ডাব্‌ল এজেন্ট। তিনিই কি আসল জেম্‌স বন্ড ?

ছিলেন। চাকরি-সূত্রে বেশ কিছু গুপ্তচর-এজেন্টকে তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন। এঁদের মধ্যে একজন দুস্কো পোপোভ।
দুস্কো পোপোভ জন্মসূত্রে যুগোস্লাভিয়ার লোক, কাজ করতেন ব্রিটিশ গুপ্তচর-বিভাগে। ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে তিনি গোপনে নাৎসি গুপ্তচরদের সঙ্গে মিশে যেতেন, সংগ্রহ করতেন জার্মানদের সব গোপন খবর। ব্রিটিশদের সম্বন্ধে ভুল খবর দিয়ে নাৎসি-বাহিনীকে পরিচালনা করতেন। অন্যদিকে, ব্রিটেনের 'ডাবল এক্স' কমিটির অন্যতম প্রাণ ছিলেন এই দুস্কো পোপোভ। ডাব্‌ল এক্স কমিটি নামের মধ্যেই তার কাজ-কারবারের রহস্য লুকিয়ে আছে। ইংরেজি ভাষায়, 'ডাবল ক্রসিং'। বাংলা করলে দাঁড়ায় দ্বৈত ভূমিকা। নাৎসি গুপ্তচর-বাহিনীর সঙ্গে মিশে যাবে কিছু ব্রিটিশ এজেন্ট, ভুল খবর দিয়ে তারা নাৎসি-বাহিনীকে ঠেলে দেবে বিপর্যয়ের মুখে। বন্ডের মতো আসল বন্ড এই দুস্কো পেপোভ খুব বিপজ্জনকভাবে বাঁচতেন। রাজকীয় জীবনযাপন করতেন, আর কর্মপটুতা ? মারাত্মক বললেও কম বলা হয়।
১৯৭৪ সালে পোপোভ একটি বই প্রকাশ করেছেন, এই বইয়ের নাম 'স্পাই-কাউন্টারস্পাই'। ঘটনার ঘনঘটা, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা...পোপোভের জীবনের অনেক ঘটনাই এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। বন্ডের মতো পোপোভও বিপদের মুখে স্থির, অবিচল থাকতেন। পোপোভ লিখেছেন, "আমি শুনেছি আমার অভিজ্ঞতা ও জীবনের ওপর কিছু-কিছু ক্ষেত্রে ভিত্তি করে ইয়ান ফ্লেমিং জেম্‌স বন্ড চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। জেম্‌স বন্ড রক্তমাংসের মানুষ হলে গুপ্তচরবৃত্তির দুনিয়ায় আটচল্লিশ ঘণ্টাও বেঁচে থাকতেন কি না সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ওই পৃথিবীতে, পদে-পদে মৃত্যু আর বিপদের হাতছানি।"
একসময় ফ্লেমিং পোপোভকে ক্যাসিনোতে দেখেছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো জুয়ার চাল দেন পোপোভ। রুলেত-টেবিলেই তিনি প্রমাণ করে দেন, জীবন নিয়ে জুয়া খেলতেও তিনি বিন্দুমাত্র পেছপা নন। আর গল্পের জেম্‌স বন্ড ? ক্যাসিনো থেকেই শুরু হয়েছিল তার অভিযান।
স্যঁ কোনারি, রজার মুর প্রমুখ অভিনেতা ওই চরিত্রে অভিনয় করে মানুষের মন কেড়েছেন। রজার মুরের পর এখন ছবিতে জেম্‌স বন্ড সেজেছেন টিমোথি ডাল্টন। ■

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) ব্রিটেনের কোন কম্পানি টাইটানিক জাহাজটি তৈরি করেছিল ? **শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলি,** ব্যারাকপুর ।
(২) B. V. O.-এর সম্পূর্ণ অর্থ কী ? **বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী,** মেদিনীপুর ।
(৩) ১৯৯০-এর বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার 'গোল্ডেন বুট' কে পেয়েছেন ? **ডোডো দাশগুপ্ত,** কলকাতা-২৪ ।
(৪) জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য দুর্যোধন কাকে নিযুক্ত করেছিলেন ? **অয়ন রায়চৌধুরী,** আসানসোল ।
(৫) ১৯৯০-এ বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাসকটের নাম কী ছিল ? **শুভ্রজিৎ সেনগুপ্ত,** মেদিনীপুর ।
(৬) প্রধানত ক'টি দ্বীপ নিয়ে বোম্বাই শহর গঠিত হয়েছিল ? **অনীককুমার সাঁই,** ঝাঁপানডাঙা ।
(৭) 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' বইটির লেখক কে ? **তথাগত দত্ত,** বহরমপুর ।
(৮) কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম ছিল 'অনিলা দেবী' ? **দেবজ্যোতি ও ধ্রুবজ্যোতি পাল,** বেহালা ।
(৯) ইতালিতে সদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড়ের নাম কী ছিল ? **পার্থসারথি ঘোষ,** মুর্শিদাবাদ ।
(১০) বি বি সি-র সম্পূর্ণ নাম কী ? **কমল সিওয়া,** জলপাইগুড়ি ।
(১১) কোন মহিলা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি উপাধি পেয়েছেন ? **উত্তম মোদক,** বর্ধমান ।
(১২) দাবার ছকে কতগুলি বর্গক্ষেত্র থাকে ? **সুমন রায়,** বর্ধমান ।
(১৩) ভারতের কোন রাজ্যে আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ? **রঞ্জন চক্রবর্তী,** ঝাঁপানডাঙা ।
(১৪) কাকে পরাজিত করে জর্জ বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ? **মহম্মদ মাসুদ,** বর্ধমান ।
(১৫) পোল্যান্ডের মুদ্রার নাম কী ? **নাজমা মণ্ডল,** কৃষ্ণনগর ।
(১৬) যুগোস্লাভিয়ার রাজধানীর নাম কী ? **সীমা দাস,** নদীয়া ।
(১৭) মহম্মদ আলি কোন ওলিম্পিকে প্রথম পদক পেয়েছিলেন ? **প্রসেনজিৎ রায়,** কলকাতা-১২ ।
(১৮) আর্জেন্টিনার মুদ্রার নাম কী ? **সুদেষ্ণা দাক্ষিত,** কৃষ্ণনগর ।
(১৯) ব্রাজিলের ফুটবলে এক সুপারস্টারের ভাল নাম হোসে ববাতো ডি ওলিভেইরা । তিনি কী নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত ? **অপরূপা মাহাতো,** ঝাড়গ্রাম ।
(২০) উত্তর-পূর্ব রেলের সদর দফতর কোথায় ? **সুকান্ত সাহা,** সালকিয়া ।
(২১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের স্ত্রীর নাম কী ? **অঞ্জন ঘোষ,** কলকাতা-২৭ ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) জওহরলাল নেহরু ।
(২) সুরেন্দ্র পাল ।
(৩) হর্ষবর্ধন ।
(৪) সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' ।
(৫) জনি ওয়াইজমুলার ।
(৬) সিলভাসা ।
(৭) প্রথম মহাযুদ্ধ ।
(৮) ভারতের আন্তঃ-বিদ্যালয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপ ।
(৯) দলাই লামা ।
(১০) পাকিস্তানের জাহাঙ্গির খান ।
(১১) Society For The Prevention Of Cruelty To Animals.
(১২) জেনিভা ।
(১৩) গ্রেট ব্রিটেন ।
(১৪) ক্যারোলাস লিনিয়াস ।
(১৫) জেসি ওয়েন্স ।
(১৬) ডঃ বি· আর· আম্বেদকর ।
(১৭) মাধিবা ।
(১৮) ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার ওপরে অবস্থিত বায়ুস্তর সম্বন্ধে যে বিদ্যায় আলোচনা করা হয় ।

জওহরলাল নেহরু

বি· আর· আম্বেদকর

জাহাঙ্গির খান

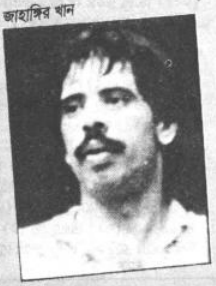

দলাই লামা

বিষয় : ইতালি

প্রশ্ন

(১) ১৮৭০ সাল থেকে রোম আধুনিক ইতালির রাজধানী। তার আগে কোন শহরে ইতালির রাজধানী ছিল ?

(২) কোন ইতালীয় রাষ্ট্রনেতা 'ইল দুচে' উপাধি নিয়েছিলেন ?

(৩) ইতালির মুদ্রার নাম কী ?

(৪) কোন নদীর ধারে রোম শহর অবস্থিত ?

(৫) রোম শহরের লোকেরা 'নদীর ওপার' বলে কী বোঝাতে চান ?

(৬) রোমের 'সেন্ট পিটার্স গির্জা' থেকে সাদা ধোঁয়া উড়ে আসা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ওই উড়ে আসা সাদা ধোঁয়া কী সূচিত করে ?

(৭) আমরা এখানে যে পিৎজা খেয়ে থাকি, তাকে মুখরোচক করার জন্য হরেক জিনিস দেওয়া হয়। আসল পিৎজায় মাত্র দু'রকম জিনিস ব্যবহৃত হয়। সেগুলি কী কী ?

(৮) 'ইতালিয়া ৯০' বিশ্বকাপে জর্জিও মোরোডার কী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ?

(৯) কোন ইতালীয় অভিনেত্রী রুপোলি পরদা থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন ফোটোগ্রাফার হিসেবে বিখ্যাত ?

(১০) 'পাস্তা' কী ?

(১১) জন্মসূত্রে ইতালীয় এক বিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। পরমাণু-বোমা ও নিউক্লীয় শক্তির আবিষ্কার এবং উন্নতির ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। তাঁর নাম কী ?

(১২) মিলানের 'লা স্কালা' পৃথিবীতে কী হিসেবে বিখ্যাত ?

(১৩) ইতালির দুই শহরের শাসনভার একসময় একজন প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত ছিল। সেই বিচারপতিকে বলা হত 'দ্য ডোজে'। কোন দুই শহরের শাসনভার তাঁর উপর ছিল ?

(১৪) 'আপ্পিয়ান পথ' কাকে বলা হয় ?

(১৫) ইতালির কোন শহরের নামে একটি সসেজের নামকরণ হয়েছে ?

(১৬) বিখ্যাত পরিচালক কার্লো পন্টি একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছেন। তাঁর নাম কী ?

(১৭) 'স্ট্রাডিভেরিয়াস' কাকে বলে ?

(গ)

(ক)

(খ)

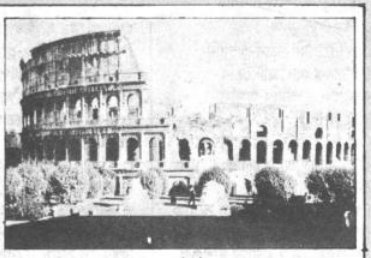

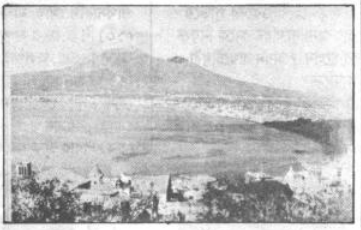

প্রশ্ন

(ক) প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। এখানেই সিংহের সঙ্গে মানুষের লড়াই হত। একে কী বলা হয় ?

(খ) ইতালির এক অতি-পরিচিত আগ্নেয়গিরি। এর নাম কী ?

(গ) এই ইতালীয় স্ট্রাইকারটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার। এঁর নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) কলোসিয়াম। (খ) ভিসুভিয়াস। (গ) রবার্তো বাজ্জো।

(১৮) ক্রিস্টোফার কলম্বাস কোন শহরে জন্মেছিলেন ?

(১৯) মধ্যযুগের ইতালির একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম কী ?

উত্তর : (১) ফ্লোরেন্স। (২) বেনিটো মুসোলিনি। 'ইল দুচে' শব্দের অর্থ, নেতা। (৩) লিরা। (৪) টাইবার। (৫) ভ্যাটিকান। (৬) আজ একজন নতুন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন। (৭) ছোট-ছোট হেরিং-জাতীয় মাছ ও ব্যাঙের ছাতা (মাশরুম)। (৮) এবারের বিশ্বকাপ-সঙ্গীতটি তাঁরই সুরে সৃষ্টি হয়েছে। (৯) জিনা লোলোব্রিজিদা। (১০) ময়দা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের শুকনো লেই। রান্না করে খেতে হয়। (১১) এনরিকো ফের্মি। (১২) অপেরা হাউস। (১৩) জেনোয়া ও ভেনিস। (১৪) রোম থেকে দক্ষিণে ব্রিন্দিসি শহরে যাওয়ার জন্য প্রাচীনকালে তৈরি এক বিখ্যাত রাস্তা। (১৫) বোলগনা। (১৬) সোফিয়া লোরেন। (১৭) উত্তর ইতালির ক্রিমোনা শহরের এক পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বিখ্যাত বেহালা তৈরি করেন। তাঁদের তৈরি ওই বেহালার নাম স্ট্রাডিভেরিয়াস। (১৮) জেনোয়া। (১৯) ইভানজেলিস্তা টরিসেলি। (২০) ভেরোনা। (২১) প্রাইমো কারনেরা। (২২) সম্রাট নিরো। (২৩) ভেনিস। (২৪) ইতালির জাতীয় ফুটবল দল। তাঁদের জার্সির রং নীল, তাই ওই নাম। (২৫) মার্কো পোলো।

(২০) শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের প্রেক্ষাপট হিসেবে ইতালির এক শহরের কথা আছে। কোন শহর ?

(২১) পৃথিবীতে একজন মাত্র ইতালীয় একবার হেভিওয়েট বক্সিং-এ বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। তাঁর নাম কী ?

(২২) রোম শহর যখন আগুনে পুড়ছিল, একজন রোমান সম্রাট তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে। তাঁর নাম কী ?

(২৩) ইতালির কোন শহরে বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয় ?

(২৪) 'আজুরি' কাদের বলা হয় ?

(২৫) কোন ইতালীয় ইউরোপে 'আইসক্রিম' প্রচলন করেছিলেন ?

হাড়ের পেছনে ছুটে সময় নষ্ট করতে লজ্জা করে না ? ওটা আমাকে দে ।
পুরনো নোংরা হাড় চুষতে তোকে হাজারবার বারণ করেছি ।
কুট্টুস ! এক্ষুনি চলে আয় বলছি !
ভৌওও
ভৌওও ! ভৌওও !
!?
আশ্চর্য ··· সত্যিই ও আমাকে ওর পিছু নিতে বলছে ।
আসছি । কিন্তু যদি এটা আর-একটা হাড় হয় তবে মজা বুঝবি ।
?
পাইলটের জ্যাকেট ! নিশ্চয় প্লেনের গুপ্তারা এগুলি লুকিয়ে রেখেছে ।
পকেটের মধ্যে কিছু ফেলে গেছে এমন আশা নিতান্তই দুরাশা ।
আরে ! এগুলি কী ? কাগজের টুকরো । কিছু ছিঁড়ে ফেলেছে । হয়তো এর থেকে কোনও সূত্র মিলবে ।
ধাঁধা চিরকালই আমার প্রিয় । এটা আসল ধাঁধা ।

কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য

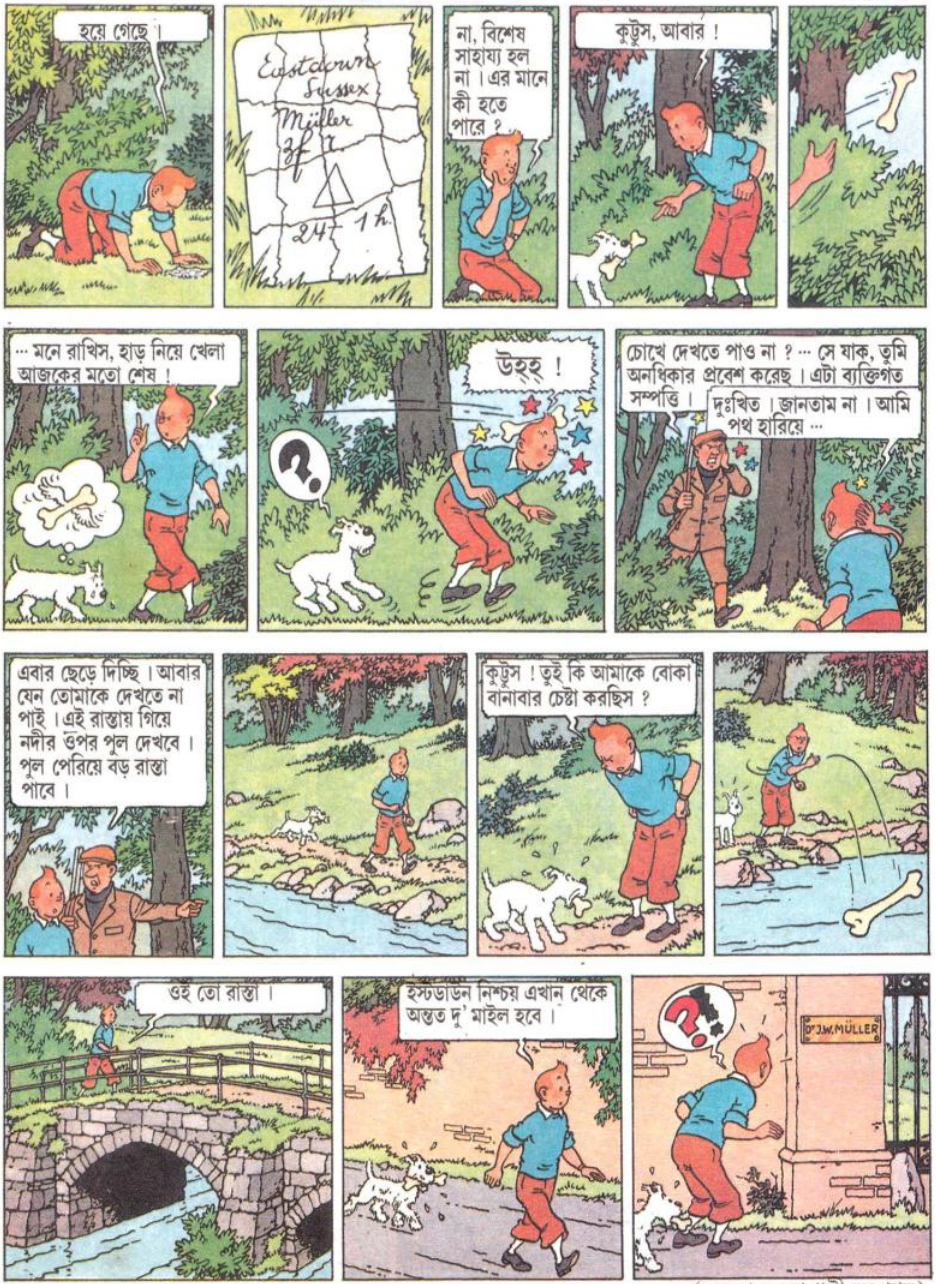

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
হুস !
ওর দু-একটা খেতে পারলে খুশি হতাম !
ভুট্টায় ১ম পুরস্কার : হিউ কয়
'চলো, মেলায় চলো ?' চিরন্তন এই ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রুস ওয়েন আর ডিক গ্রেসন গোথাম সিটি থেকে অনেক দূরে পল্লী অঞ্চলে এক বাৎসরিক পল্লীমেলায় বেড়াতে এসেছে ···
পুরস্কৃত সামগ্রী
37
শুয়োর ডাকার প্রতিযোগিতা
উইইই
শুয়োর ডাকার কৌশলের সঙ্গে নিলামে ছবির দাম হাঁকার ফারাক বিস্তর ··· তবে, গোথাম সিটিতে ···
এক ··· দুই ··· তিন ! মিঃ গ্রিনের কাছে ৪০ হাজার ডলারে বিক্রি হল !
শিল্পীর খ্যাতি চিরকালই দেরিতে জোটে ! দারিদ্র্যের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল হোমার বেনসনের, কিন্তু আজ তাঁর ছবি অমূল্য !
দুঃখের কথা, বেনসন খুব কম ছবিই এঁকেছিলেন !
ভুল, মিঃ গ্রিন ! খবর পেয়েছি, বেনসন এক খামার বাড়িতে বসে অনেক ছবি এঁকেছিলেন ··· স্বাস্থ্যের জন্য সেখানে তিনি দু' বছর ছিলেন ! ওগুলি শিগগির আমার হাতে আসবে !
কয়েক ঘণ্টা পরে মেলার মাঠের কাছে এক খামারবাড়িতে ···
আমি পুরনো জিনিস কিনি ! আপনার কি বিক্রি করার মতো পুরনো আসবাব আছে ?
আমার পুরনো আসবাবই আছে ! কিছু রদ্দি চেয়ার কিনতে চাইলে চলে আসুন ··· তবে দামটা ন্যায্য চাই !
মন্দ নয় ! এগুলোর জন্য দশ ডলার দেব ··· আর হ্যাঁ, ঘর সাজাবার জন্য কিছু পুরনো ছবিও চাই ··· কিছু আছে নাকি ?
ইয়ে ··· চিলে··· কোঠায় কিছু ছবি আছে ··· দেখতে পারেন ···
চিলেকোঠায় ···
সব হোমার বেনসন ! সব দেওয়াল-ভর্তি হয়ে আছে !
আত্মসংবরণ করো ··· জানতে দিও না···
মহৎ শিল্প নয়, তবে কাজ চলবে ! এগুলির জন্য ৫০ ডলার দেব !
উহুঁ ··· মহৎ শিল্প না হলেও ওগুলি বিক্রি করব না··· প্রত্যেকটার জন্য ৫০ ডলার দিলেও না ! শিল্পী আমার বন্ধু ছিলেন, এগুলি তাঁর উপহার ···
তা ছাড়া আমার চেনা আর প্রিয় সব কিছু রয়েছে এই ছবিতে ··· শস্য কাটার দৃশ্য, সূর্যোদয়, রবিবারের পোশাকে আমার স্ত্রী সারা··· জীবিত অবস্থায় ! অনেক রাত আমি ছবি দেখে কাটিয়েছি ! মনে হয়েছে সব সত্যি ··· সারা বেঁচে আছে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে ···
না··· আমি নিঃসঙ্গ মানুষ ··· হয়তো ভাবপ্রবণও ··· কিন্তু ছবিগুলি আমার একমাত্র সঙ্গী এবং মনে হয় খুব দুর্দিন না এলে এগুলি বিক্রি করব না !
দুর্দিন না এলে ! তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে যাওয়ার পর ওরা দেখল জঙ্গল ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। বেশ কিছুটা দূরে একটি চালাঘরও নজরে পড়ছে। ওরা সেই চালাঘরের কাছাকাছি এসে দেখল, আসলে সেটি একটি চায়ের দোকান। দোকানের সামনে পেতে রাখা বেঞ্চিতে কয়েকজন লোক বাসের প্রতীক্ষায় বসে আছে। ওরা যেতেই দোকানদার সবিস্ময়ে বলল, "তোমরা কারা গো বাছাধনেরা ? এই এত সকালে এখানে কী করে এলে ? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা চিলকিগড় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আসছি। ডুলুং নদী পেরিয়ে কনকদুর্গার মন্দির দর্শন করে শালবন পার হয়ে আসছি।"

"বেশ করেছ। কিন্তু মন্দির দর্শন কী করে করলে বাবা ? এত সকালে মন্দির তো খোলে না ?"

"নাই বা খুলল। বাইরে থেকেই মন্দির দেখলাম। আর দেখার মতো খুব একটা তো কিছু নেই।"

"তা অবশ্য নেই। তবে মন্দিরেই যখন গেলে তখন এত তাড়াহুড়ো না করে মন্দির খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই পারতে।"

এবারে তিন্নি বলল, "তাতেই বা লাভটা কী হত ? মন্দিরে বিগ্রহ তো নেই।"

"আঃ। বিগ্রহ নাই-বা রইল। বলি, পুজোপাঠ তো হয়। তাই দেখতে পারতে। দশটার সময় ঠাকুরমশাই এসে মন্দির খুললে তারপর যেতে পারতে।"

বিল্টু বলল, "আসলে আমাদের হাতে সময় খুব কম। এখন আমরা ঝাড়গ্রাম যেতে চাই। বাসটাস আছে কি কিছু বলতে পারেন ?"

"বাস আছে বইকী। অনেক বাস। আধঘন্টা অপেক্ষা করো, একটা বাসের আসবার সময় হয়ে গেছে।"

"তা যদি হয় তা হলে তার আগে একটু জলযোগ সেরে নেওয়া যাক। কী পাওয়া যাবে বলুন তো আপনার দোকানে ?"

"যা চাইবে তাই পাবে। আলুর চপ, মুড়ি, গরম জিলিপি, শুকনো বোঁদে, বাসী গজা, আর কী চাই ?"

তিন্নি বলল, "বাসী গজা ? ক'দিনের ?"

"কালকের।"

শুভঙ্কর বলল, "এখন আর টাটকা-বাসীর ব্যাপার নেই আমাদের কাছে। যা পারেন দিন। খুব খিদে পেয়েছে।"

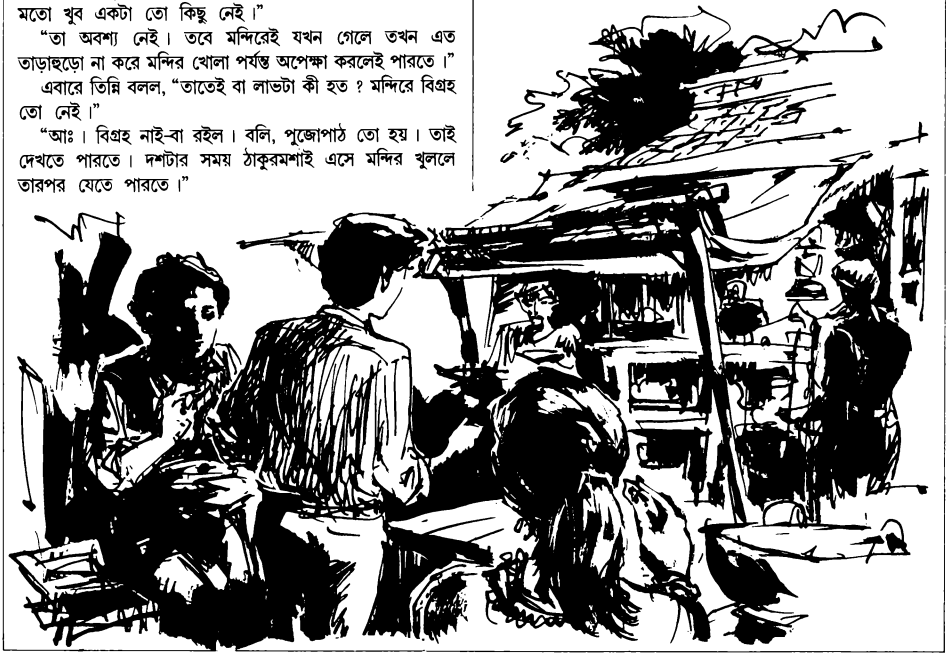

দোকানদার এইরকম খদ্দের পেয়ে তো বর্তে গেল। তাই সব কিছুই কিছু-কিছু করে দিল ওদের।

ওরা গোগ্রাসে খেয়ে নিল সব। বিশেষ করে বিল্টু আর তিন্নি তো খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। ওরা মুড়ি, তেলেভাজা, গরম জিলিপি খেয়েই ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল কয়েক গেলাস।

দোকানদার বলল, "চা দেব ?"

শুভঙ্কর বলল, "সে-কথা আবার বলতে ? এতসব খাওয়ার পরে এই সকালবেলায় একটু চা না খেলে হয় ?"

দোকানদার চা দিল। ওরা বেশ আয়েস করে দোকানে বসে যখন চা খাচ্ছে, তেমন সময় হঠাৎ একটি পুলিশের জিপ ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল সেই জঙ্গলের পথে।

দোকানদার অবাক হয়ে বলল, "বাব্বা। এত সকালে আবার পুলিশের আগমন কেন ?"

বাইরের বেঞ্চিতে বসা অপেক্ষমাণ বাসযাত্রীরা বলল, "নিশ্চয়ই কোনও খুনখারাপি হয়েছে কোথাও। তাই প্রভুদের পায়ের ধুলো পড়ছে।"

দোকানদার বলল, "কী গো ছেলেরা ! তোমরা তো এলে ওইদিক দিয়ে। সেরকম কিছু দেখলে নাকি ? মানে খারাপ কিছু ?"

"না। সেরকম কিছু তো চোখে পড়ল না। অবশ্য আমরাও তাকাইনি কোনওদিকে। আসলে আমাদের কলকাতা যাওয়ার তাড়া। ঝাড়গ্রামে যাচ্ছি ট্রেন ধরতে।"

বিল্টু বলল, "কিন্তু আধঘণ্টার ওপর তো হয়ে গেল। বাস এত দেরি করছে কেন ?"

"আসবে, আসবে। এক্ষুনি আসবে।"

এমন সময় হঠাৎ একটা ট্রাক আসতে দেখে দোকানদার ট্রাকটা থামিয়ে বলল, "এই ! এটা কোথায় যাচ্ছে এখন ? ঝাড়গ্রাম ?"

ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ, কেন ?"

"বাবুদের এই ছেলেমেয়েগুলোকে একটু তুলে নাও তো। এরা সব কলকাতার ট্রেন ধরবে।"

"স্টিলে যাবে বুঝি ?"

বিল্টু বলল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে চট করে উঠে পড়ো।"

ওরা সানন্দে খাবারের দাম মিটিয়ে দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাকে উঠে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

ট্রাক ছুটে চলল হুহু করে।

ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আসলে পুলিশের জিপ দেখে যা ভয় হয়েছিল ওদের, তা বলবার নয়। আর-একটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি। ভাগ্যিস ওরা এসে দোকানে কোনও খোঁজখবর নেয়নি। পুলিশ যে ওদেরই সন্ধানে এখানে এসেছে, তা ওরা ছাড়া আর কেই-বা জানে ? যাই হোক, বিপদ কিন্তু এখনও কাটেনি। অবশ্য শুভঙ্কর বুদ্ধি করে দোকানদারকে ওদের কলকাতা যাওয়ার কথা বলায় একটা কাজ হবে এই যে, যদি পুলিশ ওই জঙ্গল থেকে ফেরার পথে দোকানে এসে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন সবাই একবাক্যে বলবে, "হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেলেমেয়েগুলো এখানে এসেছিল বটে, তবে ওরা তো একটু আগেই ঝাড়গ্রাম চলে গেছে কলকাতার ট্রেন ধরবে বলে।" এতে হবে কি, এখানকার পুলিশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হবে। আর ঝাড়গ্রাম অথবা ঠাকরুন পাহাড়ির দিকে অযথা ওদের খোঁজে যাবে না।

ঝাড়গ্রাম এখান থেকে খুব বেশিদূরের পথ নয়। এক-দেড় ঘণ্টার রাস্তা। তবে দ্রুতগামী ট্রাক তার চেয়েও অনেক কম সময়ের মধ্যে

ওদের লেভেল ক্রসিং-এর কাছে নামিয়ে দিল।

এই জায়গাটা খুব জমজমাট। যতসব দোকানদানি হোটেল-পত্তরের মেলা। ক্রসিং পেরোলেই বাঁ দিকে বাজার। এ-বছর কী আম উঠেছে। সব দোকানে তোতাপুলি, গোলাপখাস আর বেগুনফুলি আমের পাহাড় সাজানো আছে যেন। ওরা তিনজনে চারদিকে একবার অনুসন্ধানী চোখ মেলে দেখে নিল। তারপর চিন্তা করতে লাগল কীভাবে কী করবে, তাই নিয়ে। প্রথমত, খুব সাবধানে যেতে হবে ওদের বেলপাহাড়ির দিকে। সে জায়গা যে কোথায় কতদূরে শুভঙ্কর তা জানে না, তবে বিল্টু ও তিন্নি জানে। কিন্তু মুশকিল হল এই, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গণপতিকে নিয়ে সে-পথে অভিযান কি সম্ভব ? পথিমধ্যে কোনও বিপদ ঘটলে এই দুর্লভ সামগ্রী পেয়েও হারাতে হবে। তাই কী যে করবে ওরা তা নিয়ে দারুণ চিন্তায় পড়ে গেল। কেননা ওদের শত্রু এখন একজন নয়। একদিকে শিকারিবাজ, অপরদিকে জঙ্গল শের। এ জিনিস হাতছাড়া হলে ওদেরই পোয়া-বারো।

তাই উদ্দেশ্যহীনভাবেই ওরা এদিক-সেদিকে পায়চারি করতে-করতে উপায় একটা ঠিক করল।

তিন্নি বলল, "এখন আমরা যে-কোনও বাসে শিলদায় চলে যাই চলো। ওখানে আমার মামার বাড়ি। এই মূর্তিটা যেভাবেই হোক ওখানে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমরা চলে যাব আমাদের আসল জায়গায়। তা হলে মূর্তি খোয়ানোর ভয়টা আর থাকবে না।"

বিল্টু বলল, "তোর যুক্তিটা মন্দ নয়। তবে আমার মনে হয় এখন আমাদের এখানে-ওখানে কোথাও না গিয়ে ঝাড়গ্রামেই কোনও হোটেলে উঠে পড়া ভাল।"

শুভঙ্কর বলল, "সেটা করলেও মন্দ হয় না। কিন্তু হোটেলে ওঠার খরচও তো অনেক।"

"হোটেল না হলে ধর্মশালায়। এইখানে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চমৎকার ধর্মশালা আছে। 'অগ্রসেন ধর্মশালা'। ঝকঝকে তকতকে। পাশেই নতুন মন্দির। এই ধর্মশালায় বিছানাপত্তর মশারি সব আছে।

জলকলের ব্যবস্থাও ভাল। প্রতিদিন দশ টাকা ভাড়া। বড় ঘর। তাই বলছিলাম কি, এইখানে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে আমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনকে সোনার গণপতির পাহারায় রেখে বাকি দু'জন যেতাম মউয়ের খোঁজে।"

তিন্নি বলল, "সোনার গণপতির পাহারায় থাকবেটা কে শুনি ? আমি কিন্তু ও দায়িত্ব নিচ্ছি না। তোমাদেরও ছাড়ছি না আমি। তা ছাড়া একা থাকতে দারুণ ভয় করবে আমার। যদি পুলিশ আসে বা চোর-ডাকাত আসে, তা হলে একা আমি কী করব ? ওখানে গিয়ে তোমাদের কোনও বিপদ হলে আমি জানতেও পারব না। আর মউয়ের জন্য মনটা খুব খারাপ হচ্ছে আমার।"

শুভঙ্কর বলল, "না না। এ-ব্যাপারে আমার কিন্তু একদম সায় নেই। আমাদের আর কোনওমতেই দলছুট থাকা ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, আমাদের তিনজনের এখন কোনও হোটেল বা ধর্মশালায় থাকাটাও বিপজ্জনক।"

বিল্টু বলল, "কেন, বিপজ্জনক কেন ?"

"দুপুরে যদি কেউ শয়তানি করে পুলিশকে জানিয়ে দেয় তা হলে কিন্তু সব মাটি হয়ে যাবে। আর সোনার গণপতিও চলে যাবে পুলিশের হাতে। তার চেয়ে আমি বলি কি, শিলদায় তিন্নির মামার বাড়িতেই চলে যাই চল। ওখানে তবু শান্তিতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে। মূর্তিটাও নিরাপদে থাকবে।"

তিন্নি বলল, "সেইজন্যই তো আমি বলছি আগে আমার মামার বাড়িতে যাই চলো। কেননা এত কাণ্ডের পর এই মূর্তি আবার হাতছাড়া হলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না।"

ওরা যখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এইসব আলোচনা করছে, সেই সময় হঠাৎ করে একটি বাস এল। কী প্রচণ্ড ভিড় তাতে। এ-বাসটা শিলদা যাবে।

বিল্টু বলল, "বড্ড ভিড়। কী করবি ?"

শুভঙ্কর বলল, "ভিড় তো কী হয়েছে ? আমাদের এখন জানলার ধারে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার সময় নয়। এইরকম ভিড়ভাট্টার ভেতর দিয়েই এখন আমাদের যাওয়া উচিত। যাতে কেউ কোনওরকমেই আমাদের ব্যাপারে কোনও ইনফরমেশন কাউকে দিতে না পারে। এবং সেইজন্যই আমরা তিনজনে বাসে উঠে আলাদাভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকব। যে-যার টিকিটও নিজে-নিজেই কাটব। আর শিলদা এলেই ঝুপঝাপ নেমে পড়াব এক-এক করে।"

তিন্নি বলল, "কিন্তু আমার কাছে তো বাস-ভাড়ার টাকা নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "জানি। এই নাও, পাঁচটা টাকা রেখে দাও তোমার কাছে।" বলে একটি পাঁচ টাকার নোট ওর দিকে এগিয়ে দিল।

তিন্নি সেটা নিয়ে সামনের গেট দিয়ে উঠে পড়ল বাসের ভেতর। ওরাও উঠল পেছনের গেট দিয়ে। ভুলাভেদা না কোথাকার বাস যেন এটা। শিলদা-বেলপাহাড়ি হয়ে যাবে। মানুষে ভর্তি বাসের ভেতরটা। ভাদ্র মাসের এই গুমোট গরমে গা যেন গুলিয়ে উঠছে। তিন্নি ও বিল্টুর এসব অভ্যাস আছে। কিন্তু শুভঙ্করের এই প্রথম। তাই খুবই অসুবিধে হল ওর।

এইভাবে প্রায় ঘণ্টা দুই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার পর শিলদা এলে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল সকলে। বাস এখানে ফাঁকা হয়ে গেল। আজ এখানে হাটবার। তাই হাটমুখো লোকের আধিক্যই বেশি। ওরা সকলের নজর এড়িয়ে একটি শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে তিন্নির মামাবাড়িতে এল।

তিন্নির দিদিমা তো ওকে পেয়ে কী যে খুশি তা বলবার নয়। আশি বছরের বুড়ি ঠুকঠুক করে এসে তিন্নিকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "কাল রাতে আমরা খবর পেলুম তোদের বাড়িতে নাকি ডাকাতি হয়েছে। তোকে নাকি ডাকাতরা তুলে নিয়েগেছে। তোর বাবাকেও নাকি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। সেই শুনেই তোর মামারা সবাই গেছে ধলভূমগড়ে। আজই সকালের বাসে গেছে ওরা।"

তিন্নি শিউরে উঠে বলল, "বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ? কেন, কী হয়েছে বাবার ?"

শুভঙ্কর বলল, "সব কথা তোমাকে তো বলেইছি তিন্নি। মউ আর আমি তোমার বাবাকে আহত অবস্থায় পাই। আঘাত খুব গুরুতর নয়, আবার সামান্যও নয়। সেই কারণেই হয়তো ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। তুমি অযথা চিন্তা কোরো না। উনি সেরে উঠবেন।"

দিদিমা বললেন, "কিন্তু তুই এখানে কী করে এলি ? এরা কারা ?"

"তুমি ওদের চিনবে না দিদিমা। এই হল বিল্টুদা। যাদের বাড়িতে আমরা থাকি। আর ইনি হলেন শুভদা। ডাকাতরা বিল্টুদাকেও চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে। এই শুভদাই আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমাদের আর-এক বন্ধু মউকেও নিয়ে গেছে ওরা। যতদূর সম্ভব ওরা ওকে বেলপাহাড়ির কাছে ঠাকরুন পাহাড়ির জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে। ওর খোঁজেই আমরা এখানে এসেছি দিদিমা !"

"ঠাকরুন পাহাড়ি ! ওরে বাবা ! ও তো ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের জায়গা। ওখানে কেউ যায় ?"

"আমরা যাব। না গেলে মেয়েটা বাঁচবে না।"

"কিন্তু যদি তোদের কোনও বিপদ হয় ?"

"সে আমরা বুঝেশুনে সাবধানেই যাব। এখন যা হোক দুটো কিছু তুমি খেতে দাও।"

"কী দিই বল তো ? কী আছে ঘরে ? অভাবের সংসার। দুটো ভাতে-ভাতই রেঁধে খা।"

"ওরে বাবা ! ভাত রাঁধবার সময় নেই আমাদের। মুড়ি আছে ঘরে ? থাকে তো দাও।" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টাকাকড়ি ৬

প্রাক-মৌর্য ও মৌর্যযুগের মুদ্রাব্যবস্থা

প্রাক-মৌর্যযুগেই ভারতে কোথাও-কোথাও মুদ্রা ব্যবহার হত ।
লিখেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আদিম কারিগরির সাহায্যে ও ভারতীয় শতমান তৌলরীতি অনুযায়ী তৈরি মুদ্রায় (ক শ্রেণীর) কোনও বিদেশী প্রভাব লক্ষ করা যায় না । গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে বণিকসমাজ মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করে থাকলেও (যার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই) 'মহাজনপদ' রাজ্যগুলির আমলে (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দীতে) টাঁকশালের প্রধান কর্তৃত্ব সরকারি নিয়ন্ত্রণে এসেছিল বলে মনে হয় । বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত 'খ' থেকে 'ঘ' শ্রেণীর মুদ্রা পরীক্ষা করলে একটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও মোটামুটি সুষ্ঠু মুদ্রাব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা বণিকসভা থেকে রাষ্ট্রেরই থাকা অনেক বেশি সম্ভবপর । এই ব্যবস্থায় টাঁকশালে রাজার এবং প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক শাসক ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞানের ছাপ দেওয়া হত মুদ্রার একদিকে, যাকে বলা যায় মুখ্যদিক । অন্যদিকে অর্থাৎ গৌণদিকে যেসব ছাপ লক্ষ করা যায়, সেগুলি বোধ হয় এক অঞ্চলে প্রস্তুত টাকার অন্য অঞ্চলে প্রচলনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতির চিহ্ন । দু' দিকের প্রধান ছাপগুলি ছাড়া অনেক সময় খুব ছোট-ছোট যে প্রতিছাপ দেখা যায়, সেগুলিকে মুদ্রাপরীক্ষক বা টাকা লেনদেনের কাজে অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠীদের অভিজ্ঞান বলে ধরা যায় । প্রাক-মৌর্যযুগে মুদ্রা ছিল প্রধানত রুপার তৈরি । তুলনায় তামার ব্যবহার ছিল অল্প । তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষে শতমান ওজনরীতিতে তৈরি তিনটি বাঁকা পাতের তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে । ঠিক একই ধরনের ও একই ছাপযুক্ত ৮৫টি তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশের কোশম (প্রাচীন বৎস রাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বি) অঞ্চলে উৎখননের সময় (এগুলির মধ্যে ৩৬টির ওপরে ছাপ এখন অস্পষ্ট) । এগুলি হয় গন্ধার থেকে বণিক বা ভ্রমণকারী মারফত কৌশাম্বিতে এসেছিল, অথবা গন্ধারের তামার শতমান মুদ্রার অনুকরণে কৌশাম্বিতে তৈরি

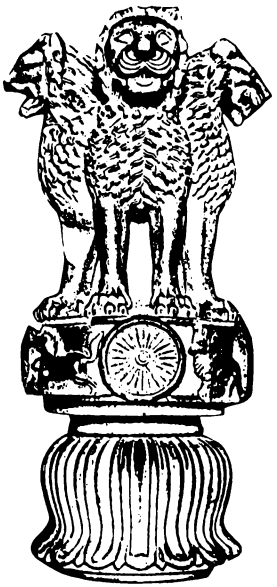

সারনাথের অশোক স্তম্ভ

হয়েছিল । মৌর্যযুগের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত এই তামার মুদ্রাগুলি ওই সময় অবধি এদের প্রচলনের ইঙ্গিত করে ।

প্রাক-মৌর্যযুগের মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রধানত উত্তর-পশ্চিম অংশে এবং গঙ্গানদীর অববাহিকায় । এই ব্যবস্থার প্রথমদিকে শতমান তৌলরীতি অনুসরণ করা হত । ঠিক কখন ও কোথায় কার্ষাপণ ওজনরীতি প্রবর্তিত হয়েছিল জানা যায় না । তবে মগধকেন্দ্রিক মৌর্য সাম্রাজ্যের আমলে কার্ষাপণ মুদ্রার সর্বভারতীয় পরিচিতি হয়ে থাকলে এ-কথা অনুমান করা যায় যে, বোধ হয় মগধেই প্রথম এই তৌলরীতি জনপ্রিয় হয়েছিল । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দীতে মগধ রাজ্যের সীমানার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে কার্ষাপণ মুদ্রার প্রচলনও বৃদ্ধি পায় । খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে নন্দ সাম্রাজ্যের সময় উত্তর ভারতের অনেকাংশে কার্ষাপণ মুদ্রা চালু হয়ে থাকতে পারে । এমনকী মুখ্যদিকে পাটা দ্বারা আহত পাঁচটি ছাপ বিশিষ্ট কার্ষাপণ মুদ্রার আবির্ভাব এই সময়ই হওয়া অসম্ভব নয় । প্রাক-মৌর্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের অধিবাসী বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণে কেবলমাত্র শতমান নয়, কার্ষাপণেরও উল্লেখ করেছেন । জিনিসপত্র কেনার জন্য শত (=শতমান) ও পণ (=কার্ষাপণ) ব্যবহারের ইঙ্গিত করেছেন পাণিনি । পণ দিয়ে কেনা যেত পণ্য বা বাণিজ্যিক দ্রব্য ।

কাত্যায়নের ভাষ্যের সাহায্যে অষ্টাধ্যায়ী আলোচনা করলে দুই বা দেড় বা শতমান ও কার্ষাপণের এবং এদের নানা ভগ্নাংশের (বা ওই মূল্যের মুদ্রার) উল্লেখ পাওয়া যায় । প্রাক-মৌর্যযুগের মুদ্রাতেও অনুরূপ ভগ্নাংশের মূল্যের মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে (যেমন পূর্বোক্ত শতমানের বিভিন্ন ভগ্নাংশ মূল্যের মুদ্রা এবং পৈলাতে প্রাপ্ত কার্ষাপণের ত্রিপাদ বা $\frac{3}{4}$ ভাগ মূল্যের ও সামিয়াওয়ালাতে আবিষ্কৃত অর্ধেক কার্ষাপণ মূল্যের মুদ্রা) । এইসব ভগ্নাংশ মূল্যের মুদ্রার প্রয়োজন ছিল সাধারণ কেনাবেচার জন্য । এগুলি দেখে মনে হয় যে, প্রাক-মৌর্য যুগেই ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু অংশে দৈনন্দিন আর্থ-সামাজিক জীবন মুদ্রা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ।

মুখ্যদিকে পাঁচটি ক্ষুদ্র ছাঁচে চিহ্নিত ছবি সমেত রুপার মুদ্রা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির তলা থেকে পাওয়া গেছে । এগুলির আকার গোল, চৌকো, আয়ত ইত্যাদি । মুদ্রাগুলি নিশ্চয়ই লেখবিহীন মুদ্রার যুগে কোনও এক সময় এই উপমহাদেশের এক বিশাল অংশ জুড়ে

প্রচলিত ছিল। ওই যুগে মৌর্যদের সাম্রাজ্য প্রায় ছিল ভারতজোড়া। শুধু তাই নয়, এই উপমহাদেশের বাইরের একাংশও এদের অধীনে ছিল। মৌর্যরা রাজত্ব করেছিলেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। কাজেই খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে নন্দ সাম্রাজ্যের আমলে পাঁচছাপ বিশিষ্ট রুপার টাকার প্রচলন থাকলেও এই জাতীয় মুদ্রার প্রচলন চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছিল মৌর্যদের আমলে।

উল্লেখযোগ্য যে, মুদ্রাগুলির মুখ্যদিকের জন্য যে বহুসংখ্যক ছবির পরিচয় জানা আছে (যেগুলি থেকে প্রতিটি মুদ্রার জন্য পাঁচটি ছাপ বেছে নেওয়া হত) তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে দুটি ধনুকাকৃতি টিবির উপর একটি ওইরকম টিবি ও তার উপরে বাঁকা চাঁদ। ঠিক এইরকম ছবি পাটনা অঞ্চলের কুমরাহারে মৌর্য প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত একটি সিলমোহরে ও খামের গায়ে উৎকীর্ণ দেখা যায়। একই ছাপ লক্ষ করা যায় রামপূর্বাতে পাওয়া সম্রাট অশোকের লেখসমেত একটি থামের সঙ্গে যুক্ত তামার পাতের ওপর। মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত তক্ষশিলাতে অশোকের আমলে বা তার অল্প পরেই পুঁতে ফেলা এক পাত্রে আবিষ্কৃত ১৬৬টি মুদ্রার অনেকক'টিতেই আলোচ্য ছবিটি উৎকীর্ণ। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে নকশাটিকে মৌর্যদের এক রাজকীয় প্রতীক বলা যেতে পারে।

যে বহুসংখ্যক ছবির কথা আমাদের জানা আছে তাদের সমন্বয়ের অর্থাৎ একই মুদ্রায় ব্যবহারের প্রকারভেদ অনুযায়ী নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সূর্য, ষাঁড়, খরগোশ, হাতি, গাছ, টিবির ওপরে গাছ, মোরগ বা খরগোশ, পুকুরে মাছ, তিনটি তীর ও ষাঁড়ের মাথার নকশাযুক্ত বৃত্ত, নানা ধরনের জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে যে পাঁচটি কোনও মুদ্রার মুখ্যদিকে ব্যবহার করা হত, তাদের মধ্যে একটি নিশ্চয়ই ছিল রাজকীয় চিহ্ন। অন্যগুলি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (টাঁকশালের অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক শাসক ইত্যাদির)। মুদ্রাগুলির গৌণদিকেও অনেক সময় ছবির ছাপ লক্ষ করা যায়।

ওজনের দিক থেকে রুপার খণ্ডগুলিকে ৩২ রতি অর্থাৎ ৫৭·২ বা ৩·৬৫ গ্রামের কার্ষাপণ মুদ্রা বলে মনে করা যেতে পারে। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে কার্ষাপণের ব্যবহার সর্বভারতীয় বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যম হয়ে পড়েছিল।

মৌর্যযুগের রুপার কার্ষাপণ

অর্ধেক-কাটা কিছু কার্ষাপণ দেখে মনে হয়, এগুলি অর্ধ কার্ষাপণ মূল্যের মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের তক্ষশিলা অঞ্চলে এবং মধ্য ভারতের আকর ও অবন্তীতে (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের মালোয়া অঞ্চলে) এক বা একাধিক ছবির পূর্ণ বা আংশিক ছাপ সমেত খুব ছোট আকৃতির ও অল্প ওজনের (·০৫৮৪-·৩৬৪২ গ্রাম) বেশ কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভারী খণ্ডগুলিকে কার্ষাপণের $\frac{1}{8}$ মূল্যের মুদ্রা মনে করা যেতে পারে।

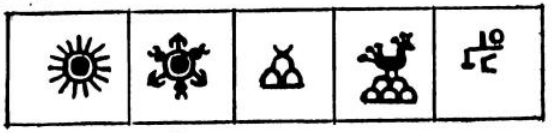

কার্ষাপণের গায়ে ছাপ দেওয়া নানা চিহ্ন

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত ছবি সমেত তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে বিভিন্ন অঞ্চলে (যেমন মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার এরান, বিহারের ভাগলপুর জেলার মাধিপুর, রাজস্থানের নাগরী প্রভৃতি)। এইসব মুদ্রায় যেমন সর্ব ভারতে পরিচিত নানারূপ চিহ্ন দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় কিছু আঞ্চলিক চিহ্নের ব্যবহার (যেমন এরানের চৌকো মুদ্রায় একটি ক্রসের চার প্রান্তে চারটি বৃত্ত সমেত ছবি)।

তামার মতো কয়েকটি অঞ্চলে বিলনের (অর্থাৎ রুপার সঙ্গে তামা বা টিন মিশিয়ে তৈরি এক সংকর ধাতুর) মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাও আছে। এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি জায়গায় $\frac{1}{8}$ ভাগ কার্ষাপণের মতো খুব ছোট আকার ও অল্প ওজনের তামা ও বিলনের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

মৌর্যযুগের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। এই বইটি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে এই সময়ে রচিত। কৌটিল্যের মতে লক্ষণাধ্যক্ষ (অর্থাৎ টাঁকশালের অধ্যক্ষ), পণ (অর্থাৎ কার্ষাপণ), অর্ধপণ, পাদপণ ও অষ্টভাগপণ মূল্যের মুদ্রা তৈরি করাবেন। ১৬ মাষ বা ৩২ রতি ওজনের মুদ্রায় ৪ মাষ তামা এবং ১ মাষ মুদ্রার ধাতুকে শক্ত করবার জন্য ব্যবহার্য ধাতু থাকবে (২, ১২)। অর্থাৎ ১৬ মাষ বা ৩২ রতি রুপার কার্ষপণে আসল রুপা থাকবে কেবল ১১ মাষ বা ২২ রতি। অর্থশাস্ত্রে রুপার পাদপণ অর্থাৎ $\frac{1}{8}$ কার্ষাপণ মূল্যের মাষক নামে তামার মুদ্রা তৈরির কথাও লেখা হয়েছে। এ ছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে অর্ধমাষক, কাকণী ও অর্ধকাকণী মূল্যের তামার মুদ্রার কথা (২, ১২)। প্রচলিত মুদ্রার মান পরীক্ষার জন্য (অর্থাৎ জাল মুদ্রার হদিস করার জন্য) 'রূপদর্শক' নামের মুদ্রাপরীক্ষক নিযুক্ত হতেন। ইনি বা লক্ষণাধ্যক্ষ কাজে গাফিলতি করলে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতেন। জাল মুদ্রা তৈরি করলে ১০০০ পণ দণ্ড এবং রাজকোষে ওই জাতীয় মুদ্রা চালাতে গিয়ে ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ডের বিধান অর্থশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে মৌর্যযুগের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়। টাকা তৈরি করবার আইনগত অধিকার ছিল বোধ হয় একমাত্র সরকারের। এই অধিকার লঙ্ঘন করে মুদ্রা জাল করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত রাজকীয় টাঁকশালে যেসব মুদ্রা তৈরি হত সেগুলিতে অনেক সময় যথেষ্ট খাদ থাকত। জনসাধারণের পক্ষে এগুলিকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ ও ব্যবহার শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আস্থার পরিচায়ক। অর্থশাস্ত্রে পণের বা কার্ষাপণের মাধ্যমে রাজকর্মচারীদের মাইনে (৫, ৩) এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ হিসাবে পণের উল্লেখ এবং রুপার কার্ষাপণের আবিষ্কারের ব্যাপকতা থেকে মনে হয় যে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার সর্ব ভারতে প্রচলন হয়েছিল মৌর্য যুগে। কোনও-কোনও অঞ্চলে তামা ও বিলনের মুদ্রাও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এইগুলি এবং খুব অল্প ওজনের রুপার, তামার ও বিলনের মুদ্রাগুলি দৈনন্দিন সাধারণ কেনাকাটার জন্য ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়।

(ক্রমশ)

বাইরের জানালা

এল শঙ্কর আর তাঁর 'এপিডেমিক্স'

পাশ্চাত্যে ভারতীয় রাগ-রাগিণী আর ধ্রুপদী যন্ত্র সঙ্গীতের কদর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সুবিখ্যাত বিটল্‌স দল, জর্জ হ্যারিসন, রোলিং স্টোনস্ দল, ফিল কলিন্‌স, পিটার গ্যাব্রিয়েল তাঁদের সুর নির্মাণে প্রায়শই ব্যবহার করেছেন ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের আবহ।

সম্প্রতি এল শঙ্করের সঙ্গীত দল 'এপিডেমিক্স' নিউ ইয়র্ক শহরে হইচই ফেলে দিয়েছে। এল শঙ্কর পাশ্চাত্যের সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতবিদ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সফল মিশ্রণে পৃথিবীর নানা দেশের শ্রোতার মন জয় করেছেন এল শঙ্কর। ব্রুস স্প্রিংস্টিন, ফিল কলিন্‌স বা ইয়োকো ওনোর মতো ওদেশে শঙ্করের জনপ্রিয়তা।

এদেশে স্কুল-জীবন কাটিয়ে লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজ এবং আমেরিকার ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পেয়েছেন 'এথনোমিউজিকোলজি'তে ডক্টরেট ডিগ্রি। পাশ্চাত্যের নানা সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে যৌথভাবে সুরসৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশও নিয়েছেন। প্রথম যে সঙ্গীত দল সৃষ্টি করেন তার নাম 'শক্তি'। আমাদের তবলা-জাদুকর জাকির হুসেন ছিলেন এই দলে। শক্তি যেসব গানের রেকর্ড প্রকাশ করে তার বিক্রিও নেহাত কম ছিল না! ১৯৮২ সালে শঙ্কর একটি নতুন দলে যোগ দেন, যার নাম 'সাধু'। এই দলটিকেই নতুন চেহারা দিয়েছেন শঙ্কর, নাম দিয়েছেন এপিডেমিক্স। শঙ্কর ও তাঁর স্ত্রী ক্যারলিন দলটি চালান।

এপিডেমিক্স-এর সদ্য প্রকাশিত রেকর্ডের নাম 'আই-ক্যাচার'। ব্রিটেন এবং আমেরিকায় ঘরে-ঘরে এই রেকর্ড বিক্রি হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছেন শ্রোতারা।

'হিউম্যান রাইটস নাউ' নামে যে পৃথিবীব্যাপী সঙ্গীত সফর আয়োজন করেছেন ব্রুস স্প্রিংস্টিন ও পিটার গ্যাব্রিয়েল, তাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে আছেন এল শঙ্কর। দিল্লির অনুষ্ঠানটিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

মহাকাশ-যাত্রিনী

আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা-মহাকাশচারী মে জেমিসন, ১৯৮৯ সালের ৪ অক্টোবর থেকে আলাবামার মার্শাল স্পেস্ ফ্লাইট সেন্টারে ট্রেনিং শুরু করেছেন। ১৯৯১ সালে তিনি মহাকাশযান 'ডিসকভারি'-তে চেপে তাঁর প্রথম মহাকাশ অভিযানে পাড়ি দেবেন। মে জেমিসনের বয়স ৩২। পেশায় তিনি ডাক্তার। স্ট্যানফোর্ড এবং করনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক। লস অ্যাঞ্জেলিস ডাক্তারি করতেন ১৯৮৬ সাল থেকে। ১৯৮৭ সালে, মহাকাশ অভিযানের জন্য তাঁকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৯১-এর মহাকাশ অভিযানটিতে তিনি উপস্থিত থাকবেন 'মিশন স্পেশালিস্ট' হিসেবে। তিনি জীবনবিজ্ঞান ও ধাতুনিষ্কাশনের

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন মহাকাশের বুকে।

মে জেমিসন ১৯৮৩-'৮৪ সালে দুর্গতদের চিকিৎসা প্রকল্পে পশ্চিম আফ্রিকায় কাজ করেছেন। তাঁর প্রিয় শখ ভ্রমণ, স্কি আর নানা আফ্রিকান শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করা। নাচতেও ভালবাসেন খুব।

মার্গারেট মি ও নতুন প্রজাতির গাছ

মার্গারেট মি একজন উদ্ভিদ-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। প্রতি বছর দুর্লভ প্রজাতির গাছ এবং ফুল আবিষ্কার করতে ইনি পৃথিবীর নানা অঞ্চলে একের পর এক অভিযানে যান। আমাজনের দুর্গম অরণ্যের মধ্যে দু'বার অভিযান চালিয়ে ইনি আবিষ্কার করেছেন দুটি নতুন প্রজাতির ব্রমেলিয়াড। তাঁর এই আবিষ্কারের আগে এই ধরনের গাছের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোনও ধারণাই ছিল না। তাঁর এই স্মরণীয় কীর্তির জন্য ওই দুটি প্রজাতির গাছের বৈজ্ঞানিক নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে। একটির নাম ইচমিয়া মিয়ানা, অন্যটির নাম নিওরেগালিয়া মার্গারেটা। গাছ দুটির চেহারাও একটু অদ্ভুত। চকচকে, শক্ত কাণ্ড, পাতার চারদিক অদ্ভুতভাবে বাঁকানো, কখনও-কখনও মনে হয় গিঁটবাঁধা। কয়েকটি নতুন প্রজাতির ফুলও আবিষ্কার করেছেন মার্গারেট মি। মুন-ফ্লাওয়ার তার মধ্যে অন্যতম।

মার্গারেট অভিযানগুলির রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন সদ্য প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইয়ের মধ্যে। টনি মরিসন সম্পাদিত বইটির নাম—মার্গারেট মি ইন সার্চ অব দ্য ফ্লাওয়ারস অব দ্য আমাজন ফরেস্টস। দাম : ১৯.৯৫ পাউন্ড। এই বই পড়লে আমরা জানতে পারি আমাজনের গহন অরণ্যে পৌঁছতে গিয়ে কীরকমভাবে তাঁর নৌকোডুবি হয়েছিল, একা-একা হাজার হাজার কিলোমিটার তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন জঙ্গলে-জঙ্গলে, খাদ্য-পানীয়ের অভাবে তাঁর প্রায় মৃত্যু হতে চলেছিল, বিষাক্ত পিঁপড়ে আর মাছির কামড়ে প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত। গল্প নয় একবর্ণও, সবটাই সত্যি। বাস্তব অ্যাডভেঞ্চারের শিহরন পাতায়-পাতায়। মোট পনেরোটি অভিযানের কাহিনী আছে বইটিতে। অরণ্যসম্পদ মানবসভ্যতার অগ্রগতির ফলে ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এজন্যও তিনি বইটির মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মার্গারেট মি-র বয়স শুনলে চমকে উঠতে হয়। তাঁর বয়স ৭৪ বছর। এই বয়সেও অক্লান্তভাবে খুঁজে চলেছেন নতুন প্রজাতির গাছ ও ফুল। বারবার বেরিয়ে পড়ছেন অভিযানে। ছবি আঁকার হাতও তাঁর সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। মুন ফ্লাওয়ারের ছবিটিই তার প্রমাণ।

অভীক মজুমদার

কতরকমের পায়রা

একই বইতে সুষ্ঠুভাবে সংযুক্ত ও প্রতিফলিত হয়েছে বিজ্ঞান, প্রকৃতি চেতনা—সঙ্গে রয়েছে অসাধারণ ফোটোগ্রাফি । এরকম দুর্লভ বই খুব বেশি চোখে পড়ে না । মিরিয়ান স্কেলেনের 'পিজিয়ন' বইটি সেদিক থেকে অপূর্ব । পায়রাদের নিয়ে এই বই । ক্রাওয়েল প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে বইটি বেরিয়েছে । দাম ১২·৯৫ ডলার ।

পায়রাদের নানা প্রজাতির **পুঙ্খানুপুঙ্খ** বর্ণনা যেমন আছে বইটিতে, তেমনই পাওয়া যাবে পায়রাদের ওড়ার কৌশল, খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থানের নানা বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি জগতে পায়রাদের অবদান ইত্যাদি অফুরন্ত বিষয় । মার্গারেট মিলার ও টমাস ওয়াই-এর তোলা ছবিগুলিও তুলনাহীন । বইটি পড়তে ছোটদের যেমন ভাল লাগবে, তারা শিখতেও পারবে অনেক কিছু ।

ভাইবোনের কীর্তি

ভাইয়ের নাম আলফি । তার ছোট বোন অ্যানি রোস আলফির সর্বক্ষণের সঙ্গী । এই দুই ভাইবোন আজব-উদ্ভট কাজকর্ম করতে আর ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ । একদিন আলফি, অ্যানি আর তার মাকে বাগান-ঘরে বন্ধ করে ফেলল । সে ঘরের চাবিও গেছে হারিয়ে । এবার আলফি নানারকম বুদ্ধি খাঁটাতে লাগল তাদের ঘর থেকে বের করার জন্য ।

আর-একদিন আলফি সারাদিন পায়ের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে—সন্ধেবেলা বুঝতে পারল সর্বক্ষণ সে উলটো জুতো পরে ঘুরে বেড়িয়েছে ।

এরকম মজার-মজার গল্প নিয়ে শার্লি হিউজেস-এর বই 'দ্য বিগ আলফি অ্যানডি অ্যানি রোস' । লপ্রপ প্রকাশনা । দাম ১৫ ডলার ।

চমৎকার রূপকথা

রূপকথার গল্প পড়তে কে না ভালবাসে ! তবে আজকাল ছোটদের খুশি করতে পারার মতো রূপকথা খুব বেশি লেখা হয় না । বেনি মনট্রেসর-এর 'দ্য উইচেস অব ভেনিস' সেদিক থেকে যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য বই ।

অনেক-অনেক দিন আগে ভেনিস শহরে পরিদের ইচ্ছেয় গাছের ফুল থেকে জন্ম নিল ফুটফুটে একটি ছেলে । কিন্তু সেই অঞ্চলে ডাইনিদের খুব উপদ্রব । বাচ্চা ছেলে পেলেই তারা ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলে । তাই ছেলেটিকে লুকিয়ে রাখা হল খড়ের তৈরি পায়রার পেটের মধ্যে ।

আস্তে-আস্তে ছেলেটি বড় হয়ে উঠল । জাদু-অস্ত্র নিয়ে ডাইনিদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করল সে । শেষে পরাজিত হল ভয়ঙ্কর ডাইনির দল । বীর ছেলেটিকে সকলে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল ।

বইটির পাতায়-পাতায় রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা । বেনি মনট্রেসর নিজে ছবিও এঁকেছেন অসাধারণ ।

প্রকাশক : ডাবল-ডে সংস্থা । দাম ১৩·৯৫ ডলার ।

গল্প এবং ইতিহাস

ভূতেরা স্বার্থপর নয়
শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম
কলেজ রো, কলকাতা-৯ ।
দাম : ১২ টাকা

রূপকথা আর বাস্তবের নানান চরিত্রের বিচিত্র অনুভূতি, স্নেহ-মায়া-মমতা ও টুকরো-টুকরো মজার ঘটনাপ্রবাহে আটটি গল্পই আকর্ষণ করবে । সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদটিও প্রশংসনীয় ।

কোচবিহারের ইতিকথা
চঞ্চলরঞ্জন দাস
হাজরাপাড়া, কোচবিহার
দাম : ৮ টাকা

ছোটরা কেবল রূপকথার গল্প, ভূতুড়ে কাহিনী, বিজ্ঞানের অ্যাডভেঞ্চার কিংবা কমিকসেই খুশি হয় না ; তারাও চায় মাঝে-মাঝে অজানা, অচেনা ইতিহাসের পাতা ওলটাতে । 'কোচবিহারের ইতিকথা'য় কিশোরদের আগ্রহী করে তোলার জন্য রয়েছে প্রায় চারশো বছরের কোচ রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস ।

শোভন মহাপাত্র

বোম্বেটে বুম্বা
শুদ্ধসত্ত্ব বসু
প্রত্যয় প্রকাশনী
কলকাতা-৯ । দাম : ২০ টাকা

বিভিন্ন স্বাদের ১৬টি গল্প নিয়ে শুদ্ধসত্ত্ব বসুর এই বইটি হাতে পেলে ছোটরা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবে । বিশেষ করে 'ছত্রপতি', 'ভূত বলে কিছু নেই' এবং 'কী করে বেকার হলাম'—গল্প তিনটি দারুণ উপভোগ্য । 'ভয়', 'ভূত বলে কিছু নেই' এবং 'সভার বক্তৃতা শুনে ভূতাগমন'—গল্প তিনটিতে তিনি বলেছেন যে, ভূতের আদপেই কোনও অস্তিত্ব নেই, সবই মানুষের মনগড়া । আবার এই সঙ্কলনে একটি ভূতের গল্পও জুড়ে দিয়েছেন তিনি 'মাত্র একজনের জায়গা' ।

জয় সেনগুপ্ত

ছড়া-ছবির মেলা

জ্যাক প্রিলুটস্কি ও গার্থ উইলিয়ামস আমেরিকার শিশুসাহিত্যের জগতে দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব । জ্যাক প্রিলুটস্কি লেখেন কবিতা বা ছড়া, আর সেই ছড়াকে নানা রঙে-রেখায় ছবিতে ফুটিয়ে তোলেন গার্থ উইলিয়ামস । কয়েক বছর আগে তাঁরা দু'জনে ছড়া-ছবির একটি অসাধারণ বই প্রকাশ করেন । নাম, 'রাইড এ পারপল পেলিকান' । ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছে এঁদের দ্বিতীয় বই 'বিনিথ এ ব্লু আমব্রেলা' । এই বইটিও ছোটদের বইয়ের জগতে একটি অতুলনীয় সংযোজন । ছড়াগুলি আসলে শিক্ষামূলক । দেশ-বিদেশের নাম আর তার রাজধানী, বিভিন্ন দিক, সমুদ্র, ধাতু, ইতিহাসের চরিত্র—এই সমস্ত বিষয়ই ছড়াগুলিতে পরিবেশন করেছেন জ্যাক প্রিলুটস্কি । ছবিগুলিও বেশ ভাল । রঙের বৈচিত্র্য মন কাড়ে । গার্থ উইলিয়ামসের প্রখর কল্পনাশক্তিতে ভরপুর । বইটির প্রকাশক গ্রিন উইলো সংস্থা । দাম ১৫·৯৫ ডলার ।

অভীক মজুমদার

ধাঁধা

কাল নাকি সেজোদাদুর জন্মদিন ছিল। আমরা জানতাম না। খেয়ালও করিনি। পরশুদিনই আমরা আর-একটা জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। ছোট্‌কার বন্ধুর মেয়ে টুপুরের জন্মদিন ছিল ৬ অগস্ট। জানি না, সেই নেমন্তন্নের কথা শুনেই সেজোদাদুর নিজের জন্মদিনের কথা মনে পড়ে গেছে কি না। তবে যেভাবেই মনে পড়ুক, আমাদের লাভ হয়েছে। মেজোদাদু এমনিতেই খাওয়াতে ভালবাসেন। কাল সন্ধেবেলা নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। খানিক পরেই প্রত্যেকের হাতে-হাতে ধরিয়ে দিলেন চিংড়ি মাছ আর ডিমভাজার কুচো ছড়ানো চাউমিনের প্লেট। রান্নাটা দারুণ হয়েছিল। সেজোদাদু যে

এত ভাল রান্না করেন, তাও আমরা কালই জানলাম। ছোট্‌কা আর থাকতে পারেনি। কখন টুক করে গিয়ে বাজার থেকে একটা মালা কিনে এনেছে। সেটা দেখি আচমকা পরিয়ে দিল মেজোদাদুর গলায়। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, "কত বয়স হল আপনার ? যদি অবশ্য..." মুখ টিপে হেসে যোগ করল ছোট্‌কা, "আজ সত্যি-সত্যি জন্মদিন হয়।" সেজোদাদু রসিকতাটা গায়েই মাখলেন না। আগে থেকেই বোধ হয় ভেবে রেখেছিলেন, তাই এর উত্তরে গলা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বেশ জোরেই বললেন, "পাঁচটি বছর পরে আমার বয়স হবে যত/তার যদি করো পাঁচগুণ/ আর, সেই গুণফল থেকে/ বাদ দাও, যা আমার বয়স আছিল/ ঠিক পাঁচ বৎসর আগে/ তার পাঁচগুণ—,/ সে-বিয়োগফলে জেনো পাবে/ আমার বয়স,/ এই মুহূর্তের।"

আমরা অবাক। এ তো প্রায় কবিতা ! এটা কবে বানালেন সেজোদাদু ? সেজোদাদু কি কবিতাও লেখেন ?
আমাদের অনুচ্চারিত প্রশ্নগুলো যেন ছোট্‌কারও মাথায় খেলে গেছে।

হাসতে-হাসতেই বলল, "যদি 'আছিল' শব্দটা না থাকত, এটা হয়ে উঠত চমৎকার একটি আধুনিক কবিতা। মিল নেই, তবু ছন্দ ঠিকঠাক।" এর পর সরাসরি আমার দিকে তাকাল ছোট্‌কা, বলল, "ধাঁধাপ্রিয় সতুবাবু, বলো তো কত বয়স হল মেজোদাদুর ? হ্যাঁ, তুমিই বলো ?"
আমি কী বলব ! আমার তো ঘোরই কাটছে না। তোমরা বলতে পারো ? এটাই তা হলে হোক **প্রথম ধাঁধা**।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এমন একটা চার অক্ষরের ইংরেজি শব্দ ভাবতে পারো, যার শেষ তিনটি অক্ষর হল ENY ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নীচের বাক্যটায় কোথায় প্রশ্নচিহ্ন বসবে, কোথায় দাঁড়ি ? ঠিকমতো বসাও।
ঘোড়ার প্রতিশব্দ হয় হাতির

গতবারের উত্তর ॥ (১) বিজয়ী সেনা দুটো খেলায় জিতেছে এবং তাদের গোলের সংখ্যা দুই। তা হলে বিজয়ী সেনার সঙ্গে অগ্রণী সঙ্ঘের এবং বিজয়ী সেনার সঙ্গে চলোর্মির খেলার ফল, দু' ক্ষেত্রেই ১—০।
অগ্রণী সঙ্ঘের তিনটি গোলই তা হলে চলোর্মির বিরুদ্ধে। এদিকে চলোর্মি একটিতে হেরেছে, একটিতে ড্র করেছে। নিশ্চিত অগ্রণী সঙ্ঘের বিরুদ্ধেই তারা ড্র করেছে। তা হলে তারাও তিন গোলই দিয়েছে অগ্রণীকে। (২) পুকুর কিংবা জামার গলা। (৩) হৃদয়বিদারক।

সত্যসন্ধ

কত কথা

কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে এবারের 'কত কথা' শুরু করি। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে চটজলদি— প্রায় শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই।
(ক) কোন্ নদ রাজসিংহাসন ?
(খ) কোন্ গ্রহ অন্যের কাছে ভারস্বরূপ ?
(গ) কোন্ গান ফুল ফোটায় ?

২। এবার তিনটি শব্দের অক্ষর উলটে-পালটে অন্য শব্দ তৈরি করতে হবে, যেমন শব্দের খেলা তোমরা মাঝে-মাঝেই পেয়ে থাকো।

(ক) কুশল। (খ) কুলীশ। (গ) কাতর।
৩। 'চাকচিক্য' শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি এবং কী-কী শব্দ পাওয়া যাবে ?

উত্তর : ১। (ক) মসনদ। (খ) গলগ্রহ। (গ) বাগান। ২। (ক) শকুল। (খ) কুশলী। (গ) তরকা। ৩। চা, চাক, কচি— মোট তিনটি শব্দ।

মজার খেলা

কোন্ বাড়িতে আর লুডোর ছক্কা নেই ? সত্যি বলতে কি, ঘরোয়া খেলার মধ্যে লুডোর তুলনা হয় না। শুধু তো দক্ষতায় এ-খেলা খেলা যায় না, যেমন ক্যারম খেলা যায়। লুডোতে বুদ্ধি করে চাল দেওয়ার ব্যাপারটা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে রয়েছে ছক্কা ফেলে কী পড়বে সেই অনশ্চিত ব্যাপারটাও। আর, এই অনিশ্চয়তার জন্যই খেলাটা জমে যায়। তবে হ্যাঁ, যে-ছক্কাটা দিয়ে খেলা দেখাবে, সেটা ঠিক-ঠিক ছক্কা কি না, আগেভাগে একটু পরীক্ষা করে নিতে ভুলো না। ভাবছ তো, ঠিক-ঠিক ছক্কা আবার কী জিনিস ? ছক্কা তো ছক্কাই। তা কিন্তু নয়। কেননা...
যাক, পরে বলব। এখন একটা চটজলদি ছক্কার খেলা শেখা যাক। ধরো, বন্ধুদের সামনে একটা ছক্কা চাললে। টেবিলের ওপর ছক্কাটা পড়ল অনেকটা পাশের ছবির মতো। দেখা যাচ্ছে দুই পড়েছে। তাই তো ? এবার যদি তুমি বন্ধুদের কাউকে প্রশ্ন করো, ওপরে তো দুই রয়েছে দেখাই যাচ্ছে, এর ঠিক উলটো দিকে অর্থাৎ একেবারে তলায় কোন সংখ্যাটা রয়েছে, বলতে পারো ?
দেখবে, অনেকেই পারবে না। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়বে। কিন্তু সত্যি কি আন্দাজ

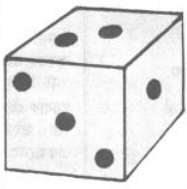

করার ব্যাপার ? তা কিন্তু নয়। ঠিক উলটো দিকে থাকবে পাঁচ। থাকবেই। কেননা, ছক্কায় এমনভাবে সংখ্যাগুলো লেখা হয়, যাতে উলটো দুটো দিকের যোগফল সবসময়েই হয় সাত। এটা অনেকেই খেয়াল করে না। আর সেইজন্যই বলছিলাম, ঠিকঠাক ছক্কা কি না আগেভাগে দেখে নিয়ো বন্ধুদের সামনে খেলা দেখাবার আগে। অর্থাৎ পাঁচের উলটো দিকে দুই, তিনের উলটো দিকে চার ইত্যাদি আছে কি না।

মজারু

Amul
MILK CHOCOLATE
বদমাইস মোটকার জন্যে
Amul
CRISP
MILK CHOCOLATE
ঘ্যানঘেনে পিংকির জন্যে
Amul
FRUIT &NUT
MILK CHOCOLATE
শয়তান ছোটকার জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
FLAVOURED
আমার সবচেয়ে আদরের প্রীতির জন্যে
Amul
Badambar
চামচা চিন্টুর জন্যে
Amul
CRUNCH
MILK CHOCOLATE
আমার টীচারের জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
Amul
CRISP
Amul
MILK CHOCOLATE
এসবই আমার জন্যে
বিক্রী ব্যবস্থায়:
গুজরাট কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিঃ
আনন্দ-৩৮৮ ০০১
আমুল চকোলেট — তোমার ভালোবাসার পাত্রের জন্যে সেরা উপহার!
RADEUS/AMC/036/90-BEN

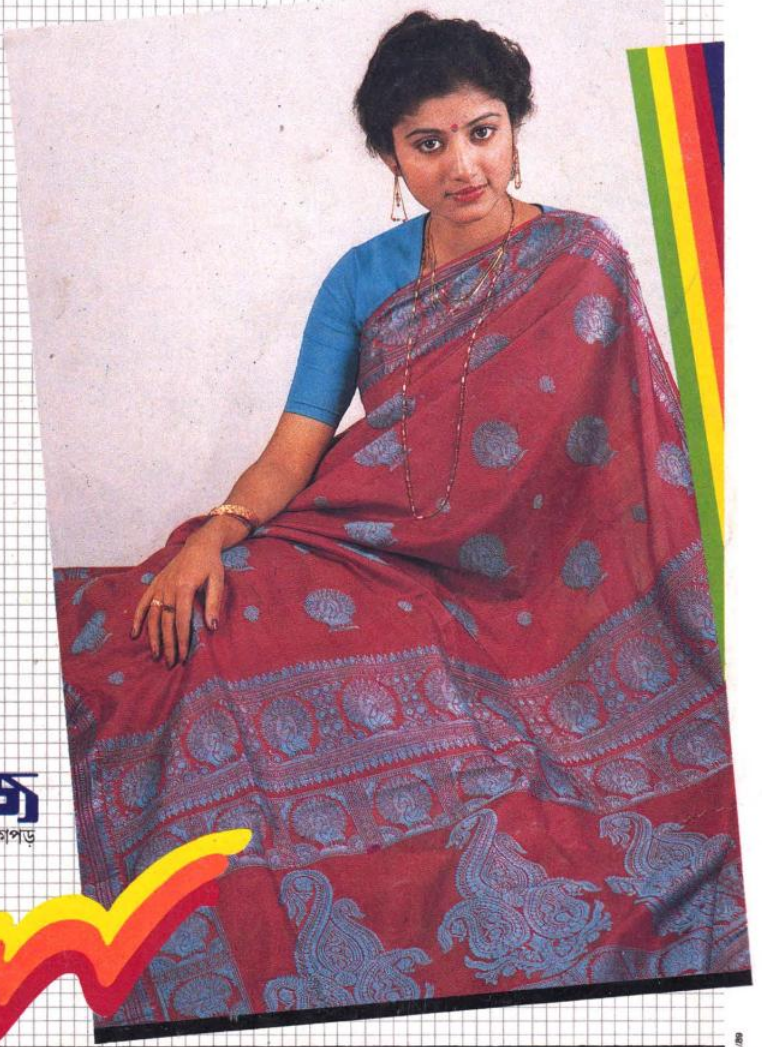

ANANDAMELA 8 AUGUST 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731